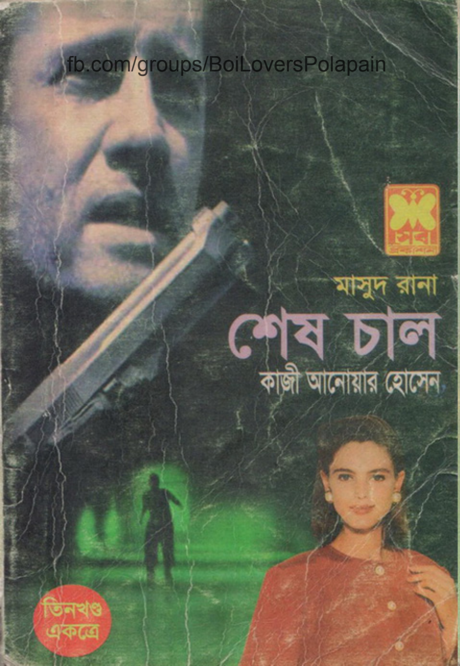


মাসুদ রানা
(তিনখণ্ড একত্রে)

শেষ চাল

কাজী আনোয়ার হোসেন

সুন্দরী মরুকন্যা নিমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে মাসুদ রানা কি চার হাজার বছর আগেকার এক ফারাও সম্রাটের বিত্তবৈভব উদ্ধার করতে আফ্রিকা যাবে? বিপদটা কী ধরনের জানার পরও?

প্রায় চার হাজার বছর আগে ক্রীতদাস টাইটা যা করেছিল, মাসুদ রানাও তাই করতে চাইছে–গিরিখাদের ভিতর ডানডেরা নদীতে একটা বাঁধ দেবে। নদীর তলায়, পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে একটা ফাটল আছে; সেই ফাটলের ভিতর কোথাও থাকলেও থাকতে পারে ফারাও মামোসের সমা ও গুপ্তধন।

সমস্ত বিপদ পায়ে দলে ওরা যখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, সরকা সৈন্য নিয়ে হামলা করে বসলেন কর্নেল ঘুমা, জার্মান ধনকুবের হেস ডুগার্ড ফারাও মামোসের সমস্ত গুপ্তধন রানার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চান। একই সঙ্গে শুরু হলো তুমুল মরশুমি বর্ষণ, সমাধির ভিতর চিরকালের জন্য আটকা পড়তে হলো ওদেরকে। বেইমানীর আভাস পে রানা, প্রশ্ন উঠল, শেষ হাসিটা কে হাসবে? কে দেবে শেষ চাল?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শেষ চাল-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

এক

ঘন কাঁটাঝোপের গাঢ় ছায়া থেকে খুদে হরিণটা বেরিয়ে আসতেই সকালের নরম রোদ লেগে রোমগুলো মসৃণ সিল্কের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সরু ফাঁকা জায়গাটা ধরে দ্বিধাহীন হেঁটে আসছে।

রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে তৈরি রানা। রিগবিতে মেটাল জ্যাকেট বুলেট ভরেছে, লাগলে ক্ষতটা চওড়া হবে না, বেরুবার সময় বড় গর্ত তৈরি করবে না।

ফাঁকা জায়গাটার পাশের কয়েকটা ঝোপের দিকে এগোল ডোরাকাটা ডিক-ডিক। নিচু একটা ঝোপে চড়ে ওপরের কচি পাতা ছিঁড়ছে দাঁত দিয়ে। নিস্তব্ধ সকালে বিকট আওয়াজ করল রাইফেল। ঝোপ থেকে শূন্যে লাফ দিল খুদে হরিণ, মাটিতে পড়ার আগেই ছোটার ভঙ্গিতে দ্রুতগতিতে পা ছুঁড়ছে। সলিড বুলেট এত জোরে আঘাত করেনি যে ছিটকে পড়ে যাবে ডিক-ডিক। হৃৎপিণ্ডে বুলেট নিয়ে ছুটল ওটা। মারা গেছে এরইমধ্যে, ছুটছে রিফ্লেক্সের বশে, রক্তস্রোতে অবশিষ্ট অক্সিজেনের জোরে।

'সর্বনাশ! না, ওদিকে না!' লাফ দিল রানা। খুদে প্রাণীটি সোজা খাদের কিনারা লক্ষ্য করে ছুটছে। অন্ধের মত শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল, পতনের সময় ডিগবাজি খেলো, অদৃশ্য হয়ে গেল ওদের দৃষ্টিপথ থেকে, নেমে যাচ্ছে প্রায় দুশো ফুট গভীর ডানডেরা নদীর গহ্বরে। ছুটে এসে কিনারায় দাঁড়াল রানা, পিছু নিয়ে এল নিমাও।

হাত দিয়ে নিমাই দেখাল, 'ওই যে, ওই যে, দেখতে পাচ্ছি!'

ডিক-ডিক সরাসরি ওদের নিচে পড়ে রয়েছে। করুণ চোখে তাকিয়ে থাকল রানা। তবে এক সেকেন্ড পরই ওর চেহারায় জেদ ফুটে উঠল। 'মারতে যখন পেরেছি, তুলে আনতেও পারব। চলুন, আপাতত আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাই।'

বিকেলে আবার ফিরে এল ওরা, সঙ্গে উস্তাভ, দু'জন ট্র্যাকার ও দু'জন স্কিনার। সঙ্গে করে ওরা নাইলনের চারটে কয়েল নিয়ে এল। প্রথমেই খাদের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে ডিক-ডিককে দেখে নিল রানা, ভয় হচ্ছিল স্রোতের সঙ্গে ভেসে গেল কিনা। তারপর কয়েলের রশি ফাঁকা জায়গাটায় লম্বা করে ফেলে সাজাবার কাজে সাহায্য করল ট্র্যাকারদের। দুটো কয়েলের রশি জোড়া লাগিয়ে গিটটা খুব ভালভাবে পরীক্ষা করল রানা। খাদের নিচে রশি ফেলা হলো, প্রান্তটা পানির সারফেস ছুঁতে তুলে আনা হলো আবার। 'একশো আশি ফুট,' মাপ শেষ করে বলল ও। 'ত্রিশ ফ্যাদম।' উস্তাভের দিকে তাকাল। 'রশি বেয়ে এতটা ওপরে ওঠা সম্ভব নয়, আপনারা আমাকে টেনে তুলবেন।'

মোটা একটা কাঁটাগাছে বাঁধা হয়েছে রশিটা। পরনে শুধু শার্ট আর খাকি

শর্টস, খাদের ঠোঁটে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে হেলান দিল রানা, রশিটা কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলে আছে, লেজের অংশটুকু ফিরিয়ে আনা হয়েছে দু'পায়ের মাঝখানে। পিছন ফিরে গহ্বরে লাফ দিল, পতন নিয়ন্ত্রণ করছে কাঁধের ওপর দিয়ে রশি ছেড়ে, ব্রেক করার প্রয়োজন হলে উরুতে পেঁচিয়ে নিচ্ছে। পেণ্ডুলামের মত দোল খাচ্ছে রানা, দু'পায়ের সাহায্যে পাথুরে পাঁচিল থেকে দূরে রাখছে নিজেকে। দ্রুত নেমে এল নিচে, পা দুটো ডুবে গেল তীব্র স্রোতে, রশির মাথায় লাটিমের মত ঘুরছে শরীরটা। যে পাথরটার ওপর পড়ে আছে ডিক-ডিক, সেটার কাছ থেকে কয়েক ফুট দূরে রয়েছে ও, কাজেই পানিতে নামতে বাধ্য হলো। রশির শেষ প্রান্ত দাঁত দিয়ে ধরে থাকল, দূরত্বটুকু পেরিয়ে এল সাঁতরে।

খুদে পাথুরে দ্বীপটায় উঠে এসে খানিক দম নিল রানা। তারপর ডিক-ডিকের চার পা এক করে বাঁধল। পিছিয়ে এসে মুখ তুলে তাকাল ওপরে। গহ্বরের মাথা থেকে উঁকি দিয়ে ওকে দেখছে উস্তাভ। 'টানুন!' চিৎকার করল রানা, রশিটা তিনবার ঝাঁকাল। টান টান হলো নাইলন, ঝাঁকি খেয়ে দ্বীপটা থেকে শূন্যে উঠে পড়ল ডিক-ডিক, গহ্বরের পাঁচিল ঘেঁষে দ্রুত উঠে যাচ্ছে ওপরে। তিন ভাগের দুই ভাগ উঠে গেছে, এই সময় কোথাও আটকাল রশিটা, তবে একটু পর নিজেই মুক্ত হলো, সাপের মত এঁকেবেঁকে খাদের কিনারায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেশ খানিক পর নিচে নেমে এল রশিটা, বুদ্ধি করে বড় তরমুজ আকৃতির একটা পাথর বেঁধে দিয়েছে উস্তাভ। খাদের কিনারা থেকে নিচে তাকিয়ে রশির নামাটা দেখছে সে, ইঙ্গিতে নির্দেশ দিচ্ছে নিজের লোকজনকে। রশিটা ধরে একটা লুপ তৈরি করল রানা, বগলের তলায় ঢুকিয়ে নিল সেটা, মুখ তুলে ইঙ্গিত দিল উস্তাভকে। টান টান হলো রশি, পাথরের ওপর থেকে শূন্যে উঠে পড়ল ওর পা। ঝাঁকি খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে ওপরে। খাদের কিনারা থেকে পঞ্চাশ ফুট নিচে পৌঁচেছে, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল রশি। পাথরের গায়ে অসহায়ভাবে ঝুলছে ও। 'কি ঘটেছে?' উস্তাভকে জিজ্ঞেস করল।

'শালার রশি কোথাও আটকে গেছে,' পাল্টা চিৎকার করল উস্তাভ। 'কোথায় আটকেছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন?'

রানার দৃষ্টি রশি অনুসরণ করল। সরু ও লম্বা একটা ফাটলে ঢুকেছে রশিটা, সম্ভবত ডিক-ডিককে তোলার সময়ও এটাতেই আটকে ছিল। তবে ডিক-ডিকের তুলনায় রানার ওজন বহুগুণ বেশি, ফলে ফাটলের ভেতর রশিটা অনেক বেশি সেঁধিয়ে গেছে। শূন্যে ঝুলে রয়েছে ও, প্রায় একশো ফুট নিচে নদী আর পাথরের দ্বীপ। 'দোল খান, ঝাঁকি দিন,' ওপর থেকে চিৎকার করল উস্তাভ।

সে চেষ্টাই করছে রানা। গহ্বরের গায়ে পায়ের ধাক্কা দিয়ে রশিটাকে যতটা সম্ভব নাড়াচাড়া করছে, পাক খেয়ে মোচড়াচ্ছে। এক সময় ঘাম ছুটে গেল, বগলের তলায় রশির ঘষা লাগায় জ্বালা করছে চামড়া। 'লাভ হচ্ছে না,' উস্তাভকে জানাল। 'টেনেই তুলতে হবে। জোর লাগান, যতটা পারা যায়।'

কয়েক সেকেন্ড পর ফাটলটার ওপরের রশি লোহার মত শক্ত ও টান টান হলো, পাঁচজন লোক যত জোরে পারা যায় টানছে। ফাটলের নিচের রশি এক চুল নড়ছে না। বজ্র আটুনি একেই বলে, বের করে আনা সম্ভব নয়। নিচে তাকিয়ে

চিন্তা করছে রানা। একটা মানুষের পতনের গতি ঘণ্টায় একশো পঞ্চাশ মাইল। এই গতিতে পানিতে নামা আর নিরেট কংক্রিটে নামা একই কথা।

আবার ওপরে তাকাল রানা। লোকগুলো এখনও সর্বশক্তি দিয়ে রশি টানছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ফাটলটার ধারাল কিনারা রশির একটা রোঁয়া কেটে দিল, রশির গা থেকে লম্বা সবুজ পোকার মত আলগা হয়ে আসছে। আঁতকে উঠে চিৎকার দিল রানা, 'থামুন, টানবেন না!' কিন্তু উস্তাভকে দেখা যাচ্ছে না, ট্র্যাকারদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে নিজেও রশি টানছে সে।

দ্বিতীয় রোঁয়াটাও ছিঁড়ে গেল। এখন মাত্র একটা রোঁয়ায় ঝুলছে রানা। ওটাও যে-কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যাবে, বুঝতে পারল ও। 'রুশ কুত্তা, কি বলছি শুনতে পাচ্ছিস–থাম, শালা! টানবি না! থাম!' কিন্তু ওর গলা উস্তাভের কানে পৌঁছায়নি। শ্যাম্পেনের ছিপি খোলার মত পপ্ করে একটা শব্দ হলো, রশির তৃতীয় ও শেষ রোঁয়াটা ছিঁড়ে গেল।

খসে পড়ছে রানা। পাথুরে দ্বীপটার কথা ভাবছে। ওটার ওপর পড়বে নাকি? শরীরের একটা হাড়ও তাহলে আস্ত থাকবে না। আর যদি পানিতে পড়ে, নির্ঘাত পাঁজর আর শিরদাঁড়া ভেঙে যাবে।

পানিতে পা দিয়ে পড়ল রানা, তার আগে বুক ভরে বাতাস নিয়ে ফেলেছে। আঘাতটা প্রচণ্ড, শরীরের প্রতিটি হাড় যেন পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি খেলো। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেলো, বন্ধ চোখের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল উজ্জ্বল আলো। নদী ওকে ঢেকে ফেলেছে। তলিয়ে গেল গভীরে। গতিটা এখনও এত বেশি, তলায় পৌঁছে যে ধাক্কাটা খেলো, মনে হলো পা ও কোমর ভেঙে শরীরের বাকি অংশ থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

তলায় বাড়ি খেয়ে ওপরে উঠছে রানা, উপলব্ধি করল পা ও কোমর অটুটই আছে। ইতিমধ্যে ফুসফুস খালি হয়ে গেছে, বাতাসের অভাবে ছটফট করছে ও। পানির ওপর মাথা তুলল কাশতে কাশতে।

প্রবল স্রোতের মধ্যে গা এলিয়ে দিল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ থেকে পানি সরাল। গহ্বরের পাঁচিল দুটো দ্রুতবেগে পিছিয়ে যাচ্ছে, আন্দাজ করল দশ নট গতিতে ভেসে যাচ্ছে ও। এই গতিতে কোন পাথরে বাড়ি খেলে হাড়গোড় না ভাঙার কোন কারণ নেই। কথাটা যখন ভাবছে, আরেকটা পাথুরে দ্বীপ পাশ কাটাল ওকে, হাত বাড়ালে ছুঁতে পারত। চিৎ হলো রানা, পা দুটো মেলে দিল সামনে। পাথর দেখলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে।

মনে মনে একটা হিসাব পাবার চেষ্টা করছে রানা, গহ্বরের সরু ও লালচে পাথরের খিলান হয়ে নিচে লাফ দিয়েছে নদী, সেই জায়গা থেকে ঠিক কতটা দূরে রয়েছে ও। তিন কি চার মাইল তো হবেই, আন্দাজ করল। আর নদী ওখানে প্রায় এক হাজার ফুট লাফ দিয়েছে। সামনে নদীর তলায় ঢাল ও উতরাইও না থেকে পারে না, ফলে তীব্র জলাবর্ত আর আলোড়নের মধ্যে পড়তে হবে ওকে একটু পরেই।

ওপরে তাকাল রানা। দু'দিকের পাঁচিল পরস্পরের দিকে কাত হয়ে পড়েছে, ফলে কোথাও কোথাও সরাসরি ওর মাথার ওপর প্রায় এক হয়ে গেছে। শুধু এক

ফালি সরু নীল আকাশ দেখা যায়, গহ্বরের ভেতরটা প্রায়-অন্ধকার আর স্যাতসেঁতে। ভাগ্য ভাল যে এটা বর্ষার মরশুম নয়। ওর মাথা থেকে পনেরো কি বিশ ফুট ওপরে পাথরের গায়ে গতবারের বন্যা তার চিহ্ন রেখে গেছে।

কিছুক্ষণ পর ক্যানিয়নে নদীর কলকল ছলছল ছাড়াও নতুন একটা আওয়াজ শুনতে পেল রানা। ভোঁতা, গুরুগম্ভীর একটা শব্দ, যতই এগোচ্ছে ততই বাড়ছে। গহ্বরের পাঁচিল পরস্পরের দিকে সরে এসেছে, সেই সঙ্গে নদীর স্রোতও এখন সংকীর্ণ একটা পথ দিয়ে ছুটছে, ফলে স্বভাবতই গতিও অনেক বেড়ে গেল। পানির আওয়াজ দ্রুত বজ্রপাত বা কামান দাগার বৈশিষ্ট্য অর্জন করছে, সমস্ত শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ক্যানিয়নের ভেতর। উপুড় হলো রানা, সবটুকু শক্তি কাজে লাগিয়ে স্রোতের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে কাছাকাছি পাথুরে পাঁচিলে পৌঁছুল। কিন্তু লাভ হলো না, হাত দিয়ে ধরা যায় এমন কিছু নেই, পাথরের গা পিচ্ছিল ও মসৃণ করে রেখেছে নদী। স্রোতের দুর্বার টানে ভেসে চলেছে রানা, তাকিয়ে দেখল চারপাশের পানি নিরেট কাঁচের মত সমতল ও মসৃণ। নদী যেন জানে সামনে কি অপেক্ষা করছে, এ তারই প্রস্তুতি।

পাঁচিলের কাছ থেকে সরে এল রানা, আবার ভাটির দিকে পা করল। অকস্মাৎ ওর নিচে বাতাস ভরা একটা জগৎ উন্মোচিত হলো, শরীরটা নিক্ষিপ্ত হলো শূন্যে। ওর চারপাশের বাতাস সাদা ফেনাময় পানিতে ভরে উঠল। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, বিপুল জলরাশির অবিরাম পতন ঝরা একটা পাতার মত কোথায় কে জানে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে।

পতনটা মনে হলো অনন্ত কাল ধরে চলছে। তারপর এক সময় আরেকবার পানিতে পড়ল রানা, ডুবে গেল সারফেস থেকে অনেক গভীরে। ওঠার সময় পানির সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হলো, বাতাসে চোখ খোলার পর দেখল জলপ্রপাতের নিচে একটা ঘূর্ণির গভীর গর্তের ভেতর রয়েছে ও। ঘূর্ণির ভেতর পানি ঘুরছে, এটা একটা গতি; আরেকটা গতি স্রোতের টানে ঘূর্ণির ছুটে চলা।

ঘুরপাক খাচ্ছে রানা। ওপরে তাকাবার সুযোগ হলে এই প্রথম জলপ্রপাতের সাদা পানি দেখতে পেল, মেলে দেয়া বিশাল চাদরের মত লাগল দেখতে। আর সামনে তাকাতে দেখতে পেল সরু একটা নির্গমন পথ, বেসিন থেকে ওই পথ দিয়েই উন্মত্ত নদী ভাটির দিকে ছুটে চলেছে। স্রোতের টানে যতই সামনে এগোচ্ছে, ঘূর্ণিটার গভীরতা ততই কমে আসছে। আপাতত নিরাপদ মনে হলো নিজেকে ওর। ঘূর্ণি নিস্তেজ হয়ে আসায় বেসিনের কিনারায় সরে এল, পাঁচিলের ফাটলে বেড়ে ওঠা ঝোপের ডাল ধরে বিশ্রাম নিচ্ছে।

পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করল রানা। পাঁচিল বেয়ে পাহাড়ের মাথায় ওঠার কোন উপায় নেই। বাঁচার চেষ্টা করতে হবে নদীর গতিপথ ধরে ভাটির দিকে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে। পাহাড়ী নদীর তলায় চড়াই-উৎরাই থাকাটা স্বাভাবিক, ফলে স্রোতের গতি বেড়ে যেতে পারে, কোথাও হয়তো পানিতে তুমুল আলোড়ন উঠবে। আরও জলপ্রপাত থাকাও বিচিত্র নয়।

পাহাড় বেয়ে ওঠার কি কোন উপায়ই নেই? পাঁচিল ধরে আরেকবার রানার দৃষ্টি ওপরে উঠে গেল। অনেক ওপরে একটা পাথর ঝুলে আছে, দেখতে

ক্যাথেড্রাল-এর উঁচু ছাদের মত। পাঁচিলের গায়ে চোখ বুলাচ্ছে, কিছু একটা ধরা পড়ল চোখে। ছকে বাঁধা ও সাজানো মনে হলো, প্রাকৃতিক হতে পারে না।

দু'সারি গাঢ় দাগ, পাথুরে পাঁচিল ধরে পানির সারফেস থেকে ওপর দিকে উঠে গেছে, একেবারে সেই দুশো ফুট ওপরের কিনারা পর্যন্ত। ঝোপের ডালপালা ছেড়ে দিয়ে সাবধানে ও ধীরগতিতে পানি কেটে এগোল রানা, পৌঁছুল যেখানে দাগগুলো পানির নাগাল পেয়েছে। কাছে এসে বুঝতে পারল, এগুলো দাগ নয়, পাথর কেটে তৈরি করা প্রতিটি চার বর্গ ইঞ্চি কুলুঙ্গি বা ফোকর। সারি দুটোর মাঝখানে বারো ফুটের মত ব্যবধান, তবে প্রতি সারির কুলুঙ্গি অপর সারির কুলুঙ্গির সঙ্গে একই সরল রেখার ওপর তৈরি। একটার ভেতর হাত গলাল রানা, কনুই পর্যন্ত ঢোকানো যায়। ওয়াটার মার্কের নিচের ফোকরগুলো ক্ষয়ে গেছে, ফলে হাতের ছোঁয়ায় মসৃণ লাগল কিনারাগুলো। তবে পাঁচিলের ওপর দিকে, ওয়াটার মার্ক ছাড়িয়ে, আকৃতিগুলো স্পষ্ট, পুরোপুরি চৌকো আর ধারাল।

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ভিড় করল মাথায়। কতদিনের পুরানো ওগুলো? পাথর কাটার জন্যে এখানে কাউকে নামতে হয়েছে, কিভাবে নামল? এত কষ্ট করে এগুলো তৈরি করার কারণই বা কি? নিচে এখানে কি আছে?

তারপর হঠাৎ রানার চোখে আরও একটা জিনিস ধরা পড়ল। পাথরে বৃত্তাকার একটা খাঁজ, দুই সারি কুলুঙ্গির ঠিক মাঝখানে, বরষা বা বন্যার পর থেকে যাওয়া জলচিহ্নের অনেকটা ওপরে। নিচে থেকে সম্পূর্ণ গোল দেখাচ্ছে, প্রাকৃতিক নয় এমন আরও একটা আকৃতি।

সাঁতার দিয়ে বারকয়েক জায়গা বদল করল রানা, বিভিন্ন কোণ থেকে জিনিসটাকে দেখছে। পাথর খোদাই করে তৈরি বলে মনে হলো, তবে আলো খুব কম থাকায় মানুষের হাতের কাজ কিনা নিশ্চিত হতে পারল না। ডিজাইনটার মধ্যে ছবি বা সংকেত যদি থাকেও, এখান থেকে দেখার উপায় নেই। কুলুঙ্গিতে পা রেখে খানিকটা ওঠার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না। একটার সঙ্গে আরেকটার দূরত্ব এত বেশি যে একটায় পা রাখার পর হাত দিয়ে দ্বিতীয়টার নাগাল পাওয়া কঠিন। চেষ্টা করতে গিয়ে প্রতিবার নদীতে পড়ে গেল ও।

নদীর পানি বরফের মত ঠাণ্ডা, রানার দাঁত পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে। তীব্র স্রোতের টানে সরু নির্গমন পথের দিকে এগোচ্ছে, ওই পথ ধরে জননী নীলনদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে সমস্ত ব্যাকুলতা নিয়ে ছুটে চলেছে ডানডেরা।

নদীর তলা এখানে সাংঘাতিক ঢালু, পানির গতি ক্রমশ বাড়ছে। একের পর এক তীব্র আলোড়নের মধ্যে পড়ল রানা, নদী যেন এখানে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নিচে নেমেছে। তারপর এক সময় খানিকটা শান্ত হলো পানি, চিৎ সাঁতার দিচ্ছে রানা। বিশ্রাম নেয়ার এই সুযোগ ছাড়া যায় না, তাকিয়ে আছে ওপরে।

ওপরে আলো খুব কম, কারণ মাথার ওপর পাথরের পাঁচিল প্রায় এক হয়ে মিশে আছে। বাতাসে ভ্যাপসা গন্ধ, ডানা ঝাপটাচ্ছে অসংখ্য বাদুড়। তবে চারদিকটা ভাল করে দেখার সুযোগ পাওয়া গেল না, সামনে থেকে আবার নদীর গর্জন ভেসে আসছে। ঢাল বেয়ে নিচের দিকে ছুটে চলেছে ডানডেরা, খড়কুটোর

মত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রানাকে। খানিক পর দিশেহারা করে তুলল ওকে, কত দূর বয়ে নিয়ে এল হিসাব নেই, হিসাব নেই সব মিলিয়ে মোট ক'টা জলপ্রপাত পার হলো।

অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলোয় ভেসে গেল চারদিক। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসায় মনে হলো কেউ যেন সরাসরি ওর চোখে সার্চলাইট তাক করেছে। রোদ লাগায় চোখ কোঁচকাল রানা, তারপর পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল ফেকাসে লাল পাথরের খিলানের নিচ দিয়ে ভেসে এসেছে ও। পাহাড়ের এই অংশটুকু ওর চেনা, নিমার সঙ্গে দেখে গেছে। ওর সামনে রয়েছে রশি দিয়ে তৈরি ঝুলন্ত ব্রিজ। ক্লান্ত শরীরটা কোন রকমে ছোট্ট সৈকতের সাদা বালির ওপর এনে তুলল রানা। বালির ওপর শুয়ে মাথার ওপর ব্রিজটার দিকে তাকাল। ক্রল করে এগোবে, সে শক্তিও অবশিষ্ট নেই। বমি করল রানা, শরীরের অর্ধেকটা এখনও নদীতে।

কাঁধে ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙল রানার। 'সুন্দরী মেম সাহেব আপনার নাম ধরে ছুটোছুটি করছেন আর কাঁদছেন! জাগুন, সাহেব, উঠুন!'

চোখ মেলে তাকাল রানা, বাটিকে দেখে বালির ওপর উঠে বসল। একই সঙ্গে কেউ হাসতে ও কাঁদতে পারে, বাটিকে না দেখলে বিশ্বাস করত না ও। বেঁচে আছে মনে পড়ে যাওয়ায় স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল, দ্রুত পরীক্ষা করে দেখে নিল হাড়গোড় সব ঠিক আছে কিনা। সন্তুষ্ট হয়ে চোখ তুলল, দেখল পাহাড়ের ঠোঁটের কাছে মোটাসোটা আর লাল দেখাচ্ছে সূর্যটাকে। তারমানে সময়টা শেষ বিকেল।

উঁচু পাড় বেয়ে ওঠার পর সরু পথ পাওয়া গেল, ঝুলন্ত ব্রিজ পেরিয়ে নদীর ওপারে পৌঁছুল ওরা। ছুটে আসছিল নিমা, উল্লাসে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে জড়িয়ে ধরল রানাকে। 'বেঁচে আছেন! আপনি বেঁচে আছেন!' হাসছে বটে, তবে চোখে জল।

'আমাকে চেনেন না? দশ ফুট লম্বা, বুলেটপ্রুফ। তবে সত্যি কথা বলতে কি, বেঁচে আছি শুধু আপনার এই আলিঙ্গনের লোভে।'

তাড়াতাড়ি রানাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল নিমা। 'অন্য কোন অর্থ করবেন না আবার!'

নিমার কাছ থেকে জানা গেল, ভাটির দিকে রানার লাশ খুঁজছে উস্তাভ আর তার ট্র্যাকাররা। আর রানার ডিক-ডিকটাকে ক্যাম্পে নিয়ে গেছে স্কিনাররা। 'ছাল ছাড়াবার সময় ওখানে আমার থাকা দরকার!' বলল রানা, বাটির কাঁধে হাত রেখে ছুটল। 'দেখা যাক সময়মত পৌঁছুতে পারি কিনা!'

•

সন্ধ্যার অন্ধকারে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ক্যাম্পে পৌঁছুল ওরা। দু'জন স্কিনার, খালিদ আর মোস্তফা, খেতে বসেছে। ওদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নিল রানা, তারপর গোসল সেরে কাপড়চোপড় পাল্টাল, ক্যানভাস রোল থেকে ছুরি বের করে চলে এল স্কিনিং শেডে। ইতিমধ্যে ওখানে একটা গ্যাস লণ্ঠন জ্বালা হয়েছে। স্কিনাররা দাঁড়িয়ে থাকল, রানা নিজেই ডিক-ডিকের ছাল ছাড়াচ্ছে।

'ভাবছি বাঁচলেন কিভাবে!' দরজায় উদয় হলো উস্তাভ। রানা জবাব দিল না,

একমনে কাজ করছে। 'এই আপনার ডোরাকাটা ডিক-ডিক? ইঁদুর বললেই হয়!' তবু রানা তাকাচ্ছে না। 'ইঁদুর শিকার শেষ হলো, এবার আমরা তাহলে আদ্দিস আবাবায় ফিরে যেতে পারি, কি বলেন?' জানতে চাইল সে।

রানা তাকে মনে করিয়ে দিল, এটা ওর সাফারি, আর চুক্তি করা হয়েছে তিন হপ্তার জন্যে। ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছেড়ে দরজার সামনে থেকে সরে গেল উস্তাভ।

কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছে রানা, দরজায় আরেকজনকে দেখা গেল পরে আছে পুরোহিতদের ঢোলা আলখেল্লা, মাথায় পাগড়ী, কথা বলার আগে তাকে রানা চিনতে পারল না। 'মঠে ওরা বলাবলি করছে, তুমি নাকি মরে গেছ দোস্ত। যদিও বিশ্বাস করিনি, তবু নিশ্চিত হতে এলাম,' বলে হাসল কমান্ডার শাফি।

মুখ তুলে হাসল রানা। 'ভেতরে এসো।'

ভেতরে ঢুকে রানার পাশে বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল শাফি। 'ভ্লাদিমির উস্তাভকে কতদিন থেকে চেনো তুমি?'

'প্লেন থেকে নামার পর,' জবাব দিল রানা। 'এক বন্ধু ওর নাম সুপারিশ করে।'

'তোমার বন্ধু ভুল করেছে,' বলল শাফি। 'তোমাকে আমার সাবধান করা উচিত, দোস্ত।' কেন সাবধান করা উচিত ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করল সে। বছর দশেক আগে মেনজিসটুর গুণ্ডাপাণ্ডারা তাকে বন্দী করে আদ্দিসের কাছাকাছি কার্ল মার্ক্স কারাগারে রেখেছিল। ওখানে ইন্টারোগেটরদের একজন ছিল উস্তাভ। তখন কেজিবি-তে ছিল সে। কথা আদায় করার জন্যে বন্দী বা বন্দিনীর পায়ুপথে প্রেশার হোস ঢুকিয়ে ট্যাপ ছেড়ে দিত। বন্দীরা ফুলতে থাকত, যতক্ষণ না তাদের নাড়ীভুঁড়ি বিস্ফোরিত হয়। শাফি পালিয়ে আসায় সে-যাত্রা উস্তাভের হাত থেকে বেঁচে যায়। মেনজিসটু ক্ষমতা হারাবার পর কেজিবি থেকে অবসর নেয় উস্তাভ, সাফারি গাইড হিসেবে কাজ শুরু করে।

প্রসঙ্গ বদলে শাফি জানাল, দিনকাল খুব অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিনা নোটিশে এই এলাকা ছাড়তে হতে পারে তাকে। আদ্দিসে এক ভদ্রলোক আছেন, নাম কর্নেল মুসা মনসুর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন, তাঁকে রানা মেসেজ দিলে শাফি পেয়ে যাবে। কোডনেম ফিশি বললে শাফিকে চিনবেন তিনি।

বিদায়ের সময় আগের প্রসঙ্গে আবার ফিরে এল শাফি। 'তোমাকে জানিয়ে রাখি, উস্তাভকে আমার খুন করতে হতে পারে।'

পরদিন সকালে ব্যথায় আড়ষ্ট শরীর নিয়ে স্কিনিং শেডে চলে এল রানা। ছাড়ানো চামড়াটা পরীক্ষা করল, নতুন করে লবণ মাখাল, তারপর খালিদ আর মোস্তফাকে নির্দেশ দিল ডিক-ডিকের খুলি পিঁপড়ের ঢিবিতে পুঁতে ফেলতে হবে, পিঁপড়েগুলো যাতে অবশিষ্ট মাংস খেয়ে ওটাকে পরিচ্ছন্ন করে তোলে।

ওখান থেকে ডাইনিং কুঁড়েতে চলে এল রানা, ব্রেকফাস্ট সেরে নিমাকে নিয়ে বেরুল মাছ ধরতে। ঝুলন্ত ব্রিজের কাছাকাছি ছিপ ফেলল ওরা। ব্রিজের ওপর

ফেকাসে লাল পাথরের খিলানটার দিকে হাত তুলে নিমাকে বলল, 'আপনাকে আসলে উস্তাভের সামনে থেকে সরিয়ে আনার জন্যে মাছ ধরতে চেয়েছি। কাল ওদিকে কি দেখে এসেছি শুনুন।'

রানার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল নিমা। ও থামতে জানতে চাইল, 'ফোকরগুলো কি হতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

'কি হতে পারে বুঝতে পারছি না। তবে বহু বছরের পুরানো ওগুলো।'

'রাজমিস্ত্রীদের জন্যে মাচা বা ভারা তৈরি করতে হলে এ-ধরনের ফোকর দরকার হতে পারে,' বলল নিমা।

'আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়!' ব্যঙ্গ নয়, রানার চোখে প্রশংসা।

'দু'একটা আইডিয়া আপনিও দিন।'

'ধর্মীয় কোন প্রতীক? কোন সংকেত?' নিমার চেহারায় সন্দেহ দেখতে পেয়ে আবার বলল রানা, 'মানলাম, গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না।'

একটা ঘাস ছিঁড়ে ডগাটা দাঁত দিয়ে কামড়াল নিমা। 'ধরুন ফোকরগুলো কাটা হয় মাচা তৈরির জন্যে। নদীর পাশে, পাহাড়ের গায়ে, মাচা কেন দরকার হবে?'

'মাছ ধরার জন্যে।'

'কিন্তু এই নদীতে মাছ খুব বেশি নেই,' বলল নিমা। 'আর কিছু দেখেছেন?'

'দু'সারি কুলুঙ্গির মাঝখানে গোল একটা আকৃতি। পাথর খোদাই করে তৈরি।'

শিরদাঁড়া খাড়া করল নিমা। 'লিপি, নাকি নকশা?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আলো কম, অত উঁচুতে পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না,' বলল ও। 'কাল তিমকাত উৎসব, মাগডাস-এ ঢোকার একমাত্র সুযোগ। এ কাজটা শেষ করার পর খাদে নেমে আরেকবার দেখতে হবে ওগুলো।'

'এবার আপনার সঙ্গে আমিও থাকব,' বলল নিমা।

ওদের জন্য দু'জন তরুণ উপাসককে এসকর্ট হিসেবে পাঠিয়েছেন বিশপ, ভিড় সরিয়ে পথ তৈরি করবে তারা। কিন্তু দেখা গেল সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছুবার আগেই এসকর্ট দু'জন সচল জনারণ্যে হারিয়ে গেল। 'কাছাকাছি থাকুন,' বলে নিমার একটা বাহু খামচে ধরল রানা, কাঁধ দিয়ে ভিড় তো নয় যেন পাহাড় ঠেলছে।

দীর্ঘ সংগ্রামের পর অবশেষে টেরেস দাঁড়িয়ে থাকা অনেকগুলো পাথুরে স্তম্ভের একটার গায়ে পিঠ ঠেকাতে পারল ওরা। এখান থেকে ক্যাথেড্রালে ঢোকার পথটা পরিষ্কারই দেখা যায়। নিমা যথেষ্ট লম্বা নয়, সামনে জনসমুদ্র থাকায় প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তাই ওকে সিঁড়ির নিচের ছোট একটা স্তম্ভের মাথায় তুলে দিল রানা। অবলম্বন হিসেবে রানার একটা কাঁধ আঁকড়ে ধরল নিমা, কারণ ওর পিছনেই গভীর খাদ, নিচে বয়ে চলেছে নীলনদ।

উপাসকরা একঘেয়ে সুরে ভক্তিগীত গাইছে। মিউজিশিয়ানদের বারোটা গ্রুপ ড্রাম সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। প্রতিটি ব্যান্ডকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ভক্তরা, তাদের পরনে বিচিত্র বাহারি আলখেল্লা, মাথার ওপর বহুরঙা ছাতা।

প্রচণ্ড গরম আর উৎকট দুর্গন্ধের মতই জনারণ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বিপুল উত্তেজনা আর প্রত্যাশা। গান ও বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে উন্মাদনা ক্রমশ বাড়ছে; হাজার হাজার উপাসক, ভক্ত, পূজারি, যেন একটিমাত্র জ্যান্ত প্রাণীতে পরিণত হয়ে বিশেষ একটা ছন্দে দোল খাচ্ছে।

হঠাৎ করে ক্যাথড্রালের ভেতর থেকে পিতলের অনেকগুলো ঘণ্টা একযোগে বাজতে শুরু করল, পরমুহূর্তে সেই কান ঝালাপালা করা আওয়াজের সঙ্গে যোগ দিল কয়েক শো হর্ন আর ট্রামপিট বা ভেরী। সিঁড়ির মাথায় গোত্রপ্রধানদের দেহরক্ষীরাও বসে থাকল না, অটোমেটিক রাইফেল থেকে ফাঁকা গুলিবর্ষণ শুরু করল বিরতিহীন। মহিলারা শুরু করল উলুধ্বনি, সে আওয়াজ যেমন রোমহর্ষক তেমনি রক্ত পানি করা। ধর্মীয় উন্মাদনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পুরুষদের চেহারা। মেঝেতে হাঁটু গাড়ল তারা, আকুল আবেদন জানাবার ভঙ্গিতে মাথার ওপর দু'হাত তুলে ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা চাইছে। মহিলারা তাদের শিশুসন্তানকে মাথার ওপর তুলে ধরল, কৃষ্ণবর্ণ গাল বেয়ে অনর্গল নেমে আসছে চোখের পানি।

আন্ডারগ্রাউন্ড চার্চ থেকে গেট হয়ে বেরিয়ে এল পুরোহিত আর সন্ন্যাসীদের একটা বিশাল মিছিল। প্রথমে এল সাদা আলখেল্লা পরা ভক্তরা, তাদের পিছু নিয়ে এল তরুণ উপাসকদের দল, আজ নদীর কিনারায় তারা ব্যাপ্টাইজড় হবে। বাটিকে চিনতে পারল নিমা, আশপাশের কিশোরদের চেয়ে যথেষ্ট লম্বা সে, চোখাচোখি হতে লজ্জা পেয়ে হাসল।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। কড়াই আকৃতির জায়গাটা ছায়ার ভেতর অস্পষ্ট দেখাচ্ছে, মাথার ওপর ঝুলে আছে দু'একটা রুপালি তারা নিয়ে রক্তবর্ণ শামিয়ানার মত সরু আকাশ।

পথের মাথায় পিতলের একটা পাত্রে কয়লা জ্বলছে, পুরোহিতরা সেটাকে পাশ কাটাবার সময় হাতের মশাল গুঁজে দিচ্ছে ভেতরে, অমনি দপ করে জ্বলে উঠছে মশালের মাথা।

তরল লাভা স্রোতের মত মশাল মিছিল কুণ্ডলী ছাড়াতে শুরু করল পাহাড়-প্রাচীরের গা থেকে, প্রিস্টরা সুর করে গান করছেন, ড্রামের গুরুগম্ভীর আওয়াজ পাহাড়ে লেগে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ব্যাপ্টিজম প্রার্থীদের পিছু নিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রিস্টরা, তাঁদের আলখেল্লায় পিতলের তৈরি রুপালি ক্রস সাঁটা, মাথায় জড়ানো সিল্ক পট্টি, অনেকেই ব্যানার বহন করছেন। তাঁদের পিছনে দু'জন প্রিস্টকে দেখা গেল, ট্যাবট বহন করছেন। প্রিস্ট দু'জন অস্বাভাবিক লম্বা, মাথায় রত্নখচিত পাগড়ী, পরনে বহুরঙা আলখেল্লা। আর্ক অভ ট্যাবারন্যাকল বা চন্দ্রাতপ আবৃত আসন লাল কাপড়ে মোড়া, সেটা জমিনে লুটিয়ে পড়েছে। কাপড়ে মোড়ার কারণ অপবিত্র বা পাপীরা যাতে চামড়ায় চোখে ওটাকে সরাসরি দেখার সুযোগ না পায়।

মিছিলের শেষ দিকে যোগ দিলেন ওলি জারকাস। আজ তিনি নীল পাথর লাগানো মুকুটটা পরেননি। পরেছেন ইপিফানি ক্রাউন। চকচকে ধাতু-খণ্ড আর বহুমূল্য পাথর দিয়ে সাজানো। মুকুটটা এত ভারী, প্রধান পুরোহিতের প্রাচীন ঘাড় ওটার ভারে নুয়ে পড়েছে। দু'জন তরুণ ভক্ত তাঁর কনুই ধরে গাইড করছে।

অনিশ্চিত পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে নামছেন তিনি। এই সিঁড়িপথই নীল নদীর দিকে নেমে গেছে।

মিছিল এগোচ্ছে, সেই সঙ্গে সিঁড়ির মাথায় বসে থাকা লোকজন সিধে হলো নিচে নামার জন্যে। টেরেস খালি হয়ে আসছে দেখে নিমাকে স্তম্ভের ওপর থেকে নামিয়ে মিছিলে যোগ দিল রানা, জায়গাটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবার আগেই চার্চের ভেতর ঢুকে পড়তে হবে ওদেরকে। জনস্রোত সামনে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তারই মধ্যে একপাশে সরে আসছে ওরা, উদ্দেশ্য চার্চের প্রবেশমুখে পৌঁছুনো। সামনে উস্তাভ আর রুবিকে দেখতে পেল ওরা, তবে তারা ওদেরকে দেখতে পায়নি।

চার্চের আউটার চেম্বারে ঢোকার গেটে এসে মাথা নিচু করল রানা, ভেতরে ঢুকে আবছা অন্ধকারে কাউকে দেখতে পেল না। ভেতরের গেটগুলোয় কোন প্রহরী নেই দেখে সাইড ওয়াল ঘেঁষে এগোল ও, এক হাতে নিমার কব্জি ধরে আছে, অপর হাতে ব্যাগটা। সামনেই ঝুলছে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা পর্দা। ভারী পর্দা তুলে ভেতরে গা ঢাকা দিল ওরা।

পর্দার কাঁপন তখনও পুরোপুরি থামেনি, সবেমাত্র দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা, কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ ভেসে এল কানে। পর্দা সামান্য ফাঁক করে বাইরে তাকাল রানা। সাদা আলখেল্লা পরা চারজন প্রিস্ট চার্চের ভেতর দিক থেকে এগিয়ে আসছেন, আউটার চেম্বার পার হয়ে গেটের সামনে থামলেন, বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিলেন মেইন গেট।

'আজ রাতে আর ওই গেট খোলা হবে না,' ফিসফিস করল রানা। 'ভেতরে আটকা পড়েছি আমরা।'

'কেউ আমাদেরকে বিরক্ত করবে না,' জবাব দিল নিমা। 'চলুন, এখুনি কাজ শুরু করি।'

পা টিপে টিপে পর্দার আড়াল থেকে বেরুল ওরা, আউটার চেম্বার পার হয়ে একটা দরজার দিকে এগোল। নিমাকে নিয়ে মিডল চেম্বারে পা রাখল রানা।

প্রথম চেম্বারের তুলনায় আকারে ছোট আর নিচু এটা। দেয়ালচিত্রগুলোয় সম্ভবত নিয়মিত রঙের প্রলেপ লাগানো হয়। মেঝে খালি, শুধু বাঁশ দিয়ে পিরামিড আকৃতির একটা কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, তাতে দাঁড়িয়ে আছে পিতলের তৈরি প্রদীপ, প্রতিটি প্রদীপে তেলের ওপর ভাসছে সলতে। আলোর অন্য কোন উৎস চোখে পড়ল না। সিলিং আর চেম্বারের কুলুঙ্গিগুলোয় অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে।

মেঝে পেরিয়ে আরেকটা দরজার দিকে এগোল রানা, মাকডাসে ঢুকতে হলে এই তালামারা দরজা পেরুতে হবে ওদেরকে। টর্চ বের করে দরজাটা পরীক্ষা করল ও। দুটো কবাটেই সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের প্রতিকৃতি খোদাই করা রয়েছে, মাথার চারধারে আলোর একটা বৃত্ত, ডান হাত আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে ওপরে তোলা।

তালাটা কয়েকশো বছরের পুরানো, ব্যাগ থেকে যন্ত্রপাতি বের করে খুলতে বিশ সেকেন্ডের বেশি লাগল না। তালা খোলার পর একটা কবাটে কাঁধ ঠেকিয়ে চাপ দিল রানা। কব্জায় তেল দেয়া হয় না, ক্যাঁচক্যাঁচ করে প্রতিবাদ জানাল।

ভেতরে ঢোকার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ফাঁক হলো কবাট, ভেতরে ঢোকার পর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিল।

মাকডাসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বোবা বিস্ময়ে চারদিকে তাকাল ওরা। হোলি অব হোলিজ খুব ছোট একটা চেম্বার, এত ছোট হবে বলে ওরা ধারণা করেনি। দশ-বারো কদম ফেললে এক মাথা থেকে আরেক মাথায় পৌঁছুনো যায়। গম্বুজ আকৃতির ছাদ এত নিচু, পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে হাত উঁচু করলে ছোঁয়া যাবে।

মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সারি সারি শেলফ, ভক্তদের দেয়া উপহারসামগ্রী সাজানো রয়েছে–ট্রিনিটি ও ভার্জিন আইকন, বাইজেনটাইন স্টাইলে গড়া, অলংকৃত রূপোয় মোড়া। সেইন্ট আর সম্রাটদের খুদে স্ট্যাচুও আছে। আর আছে পালিশ করা মেটাল দিয়ে তৈরি পাত্র, গহনার বাক্স, মেডেল, মালা, শাখা-প্রশাখা সহ মোমদানি–প্রতিটিতে মোমবাতি জ্বলছে।

মেঝের মাঝখানে সিডারউডের অলটার, প্যানেলে বিশ্ব সৃষ্টির ছবি খোদাই করা–স্বর্গ থেকে আদমের পতন থেকে শুরু করে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সবই দেখানো হয়েছে। সিল্কে মোড়া অলটার, ক্রসটা রূপোর তৈরি। প্রধান পুরোহিতের মুকুট মোমবাতির আলোয় চকচক করছে, টাইটার নীল সেরামিক সীল মুকুটটার ঠিক কপালের মাঝখানে।

নিঃশব্দে এগিয়ে এসে অলটারের সামনে হাঁটু গাড়ল নিমা। প্রার্থনায় বসে মাথা নত করল ও। অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা, মোটেও বিরক্ত হচ্ছে না।

নিমার প্রার্থনা শেষ হতে ওর পাশে চলে এল রানা। 'ট্যাবট স্টোন!' ইঙ্গিতে অলটারের সামনেটা দেখাল। একসঙ্গে সেদিকে এগোল ওরা। মাকডাসের পিছনে কাপড় মোড়া একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে। রূপো আর সোনার তৈরি সুতোয় এমব্রয়ডারি করায় কাপড়টা ভারী বলে মনে হলো। কাঠামোটা মানুষের মতই লম্বা। ওটাকে ঘিরে ঘুরছে দু'জন, ছুঁতে ভয় পাচ্ছে–যদি প্রত্যাশা পূরণ না হয়! উত্তেজনা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে উপাসনালয়ের পিছন দিকের দেয়ালে তাকাল রানা, ওদিকে বার লাগানো একটা গেট রয়েছে। 'সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের সমাধি!' বলে গ্রিলের দিকে এগোল। ওর পাশে চলে এল নিমা। কাঠের গায়ে চৌকো ফোকর, সেগুলোর একটা দিয়ে ভেতরে তাকাল। ভেতরটা অন্ধকার। ফোকরের ভেতর টর্চ ঢুকিয়ে বোতামে চাপ দিল রানা।

টর্চের আলোয় রঙধনুর সব ক'টা রঙ ওদের চোখ যেন ধাঁধিয়ে দিল। আলোটা চোখে সয়ে আসতে চেঁচিয়ে উঠল নিমা, 'ওহ্, সুইট হেভেন!' এমন কাঁপুনি শুরু হলো, যেন প্রবল জ্বরে ভুগছে ও। মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে যাওয়ায় ফেকাসে হয়ে গেল চেহারা।

সেলের মত দেখতে সমাধি কক্ষের পিছনের দেয়ালে, একটা পাথুরে শেলফের ওপর, সেট করা হয়েছে কফিনটা। কফিনের গায়ে একটা মানুষের প্রতিকৃতি আঁকা, ভেতরে শুয়ে থাকা মানুষটার আদলে। ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে, অনেক জায়গাতেই রঙ নেই, তাসত্ত্বেও মানুষটার ম্লান চেহারা, লালচে দাড়ি ইত্যাদি আলাদাভাবে চেনা যায়।

নিমার বিস্ময় বোধ করার এটাই একমাত্র কারণ নয়। কফিন শেলফটার ওপরে এবং দু'পাশে তাকিয়ে আছে ও। ওখানে যেন বিভিন্ন রঙের দাঙ্গা বেধে গেছে, দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চিতে সূক্ষ্ম ও দৃষ্টিনন্দন পেইন্টিং সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নেয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এতকাল পরও পেইন্টিংগুলো অক্ষত ও অম্লান রয়েছে কিভাবে।

ওগুলোর ওপর টর্চের আলো ঘোরাল রানা, যেন পড়ে যাবার ভয়ে রানার একটা বাহু আকড়ে ধরে থাকল নিমা। ওর আঙুল রানার মাংসে সেঁধিয়ে যাচ্ছে, অথচ রানা কোন ব্যথা অনুভব করছে না।

বড় বড় যুদ্ধের দৃশ্য দেখানো হয়েছে, নীলনদের পানিতে যুদ্ধজাহাজগুলো পরস্পরের মুখোমুখি। আছে শিকারের দৃশ্য, সিন্ধুঘোটক আর বিশাল সব হাতিকে ধাওয়া করছে শিকারীরা, লম্বা গজদন্ত রোদ লেগে চকচক করছে। কোথাও রক্তপিপাসু পদাতিক বাহিনী উন্মত্ত আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রতিপক্ষ বাহিনীর ওপর। শত শত রথ নিয়ে বীর যোদ্ধারা ছুটে চলেছে রণক্ষেত্র অভিমুখে, গিরিখাদের তলায় ধুলো উড়ছে, ঘোড়সওয়ারদের অস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

প্রতিটি দেয়ালচিত্রের নিচের দিকে দীর্ঘদেহী এক যোদ্ধার মূর্তি দেখা যাচ্ছে। একটা দৃশ্যে সে তার ধনুক পুরোপুরি টেনে ধরেছে, আরেকটায় ব্রোঞ্জের তৈরি তলোয়ার ঘোরাচ্ছে। শত্রুরা মাথা নোয়াচ্ছে তার সামনে, সে তাদেরকে পায়ের নিচে পিষছে, কিংবা অনেকগুলো মাথা একহাতে ধরে অট্টহাসি হাসছে।

টর্চের আলো সেন্ট্রাল প্যানেলের ওপর স্থির করল রানা। কফিনের ওপর দেয়ালটা কাভার করছে এই প্যানেল। এখানে দেবতুল্য সেই মূর্তি রথের ওপর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে, তার এক হাতে ধনুক, অপর হাতে বল্লম। মাথায় পাগড়ী বা হেলমেট নেই, চুলগুলো তার পিছনে পতাকার মত উড়ছে–সিংহের সোনালি কেশর যেন। চেহারায় আভিজাত্য ও গর্ব, দৃষ্টিতে অদম্য স্পর্ধা।

তার নিচে ক্লাসিকাল ঈজিপশিয়ান হায়ারোগ্লিফিক্সে লেখা কয়েকটা লাইন। গলা খাদে নামিয়ে অনুবাদ করল নিমা,

গ্রেট লায়ন অভ ঈজিপ্ট
বেস্ট অভ ওয়ান হানড্রেড থাউজেন্ড
হোল্ডার অব দ্য গোল্ড অব ভ্যালার
ফারাও'স সোল কম্প্যানিয়ন
ওয়ারিয়র অভ অল দা গডস
মে ইউ লিভ ফর এভার!

প্রবল আবেগে ফুঁপিয়ে উঠল নিমা, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'এই শিল্পীকে আমি চিনি। তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে পাঁচ বছর গবেষণা করেছি। আমি যীশুর কসম খেয়ে বলতে পারি, এই দেয়ালচিত্র চার হাজার বছর আগে ক্রীতদাস টাইটার আঁকা। আর এই সমাধির ডিজাইনও তারই করা।' হাত তুলে কফিন রাখা শেলফের খানিক ওপরে পাথরে খোদাই করা নামটা দেখাল। 'না, এটা কোন ক্রিশ্চান সেইন্টের কফিন নয়। কয়েক শো বছর আগে কোন একজন প্রাচীন প্রিস্ট হঠাৎ এটা দেখতে পান, নিজ ধর্মের নামে দখল করে নেন।'

কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস ফেলল ও। 'ওদিকে তাকান! ওটা ট্যানাস-এর সীল–লর্ড হারেব, সমগ্র মিশরীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার, রানী লসট্রিস-এর প্রেমিক, প্রিন্স মেমনন-এর ন্যাচারাল ফাদার, যিনি পরে ফারাও টামোস হয়েছিলেন।'

অনেকক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'সবই তাহলে সত্যি। সপ্তম স্ক্রোলের সমস্ত রহস্যই দেখা যাচ্ছে এখানে। এখন শুধু চাবিটা পেলেই হয়।'

'হ্যাঁ, চাবি–টাইটার স্টোন টেস্টামেন্ট!' ধীরে ধীরে ঘুরল নিমা, চেহারায় শ্রদ্ধা আর ভয় ফুটে রয়েছে, এগোচ্ছে ট্যাবট স্টোনটার দিকে। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ও। 'রানা, আমার ভয় করছে। যা ভেবেছি ওটা হয়তো তা নয়। প্লীজ, আপনি দেখুন!'

লম্বা কাঠামোটার সামনে এসে দাঁড়াল রানা, কাপড়টা সরিয়ে নিল। ফেকাসে লাল একটা গ্র্যানিট পিলার দেখতে পাচ্ছে ওরা, গায়ে বহুরঙা চিত্রবিচিত্র দৃশ্য খোদাই করা। পিলারটা প্রায় ছ'ফুট লম্বা, গোড়ার দিকে এক বর্গফুটের মত হবে। ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়ায় চ্যাপ্টা বা সমতল চূড়ার কাছে আধ বর্গমিটার দাঁড়িয়েছে। গ্র্যানিট প্রথমে পালিশ করা হয়েছে, খোদাই করা হয়েছে পরে। এগিয়ে এসে ঠাণ্ডা পাথরটা ছুঁলো নিমা, হায়ারোগ্লিফিক্সের ওপর হাত বুলাচ্ছে। 'আমাদেরকে লেখা টাইটার চিঠি,' ফিসফিস করল ও। খোদাই করা লিপির ভিড় থেকে একটা প্রতীকচিহ্ন খুঁজে নিল–ডানাভাঙা একটা বাজপাখি। ওটা স্পর্শ করার সময় আঙুলগুলো কাঁপতে শুরু করল। 'লেখা হয়েছে প্রায় চার হাজার বছর আগে। প্রতীক্ষায় আছে, এত বছর পর আমরা পড়ব, অর্থ উদ্ধার করব। দেখুন কিভাবে সে সই করেছে।' গ্র্যানিট পিলারটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে নিমা, পালা করে চারটে দিকেই পরীক্ষা করছে, হেসে উঠে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, কখনও বা ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ছে, তারপর আবার হাসছে, যেন একটা প্রেমপত্র পড়ছে ও।

'পড়ে শোনান আমাকে,' বলল রানা। 'ক্যারেক্টরগুলো বুঝতে পারি, তবে সেন্স বা মিনিং সহজে ধরতে পারি না। আপনি ব্যাখ্যা করুন।'

'নিখাদ টাইটা!' হেসে উঠল নিমা, উত্তেজনায় লালচে হয়ে উঠেছে চেহারা। 'বরাবরের মত অস্পস্ট ভাষায়, ধাঁধার সাহায্যে মেসেজ দিয়েছে এখানেও। এ সম্ভবত তার নিজস্ব কোন কোড।' একটা হায়ারোগ্লিফিক্স লাইনে আঙুল রাখল, অনুবাদ করার সময় লাইনটা অনুসরণ করছে আঙুল দিয়ে। 'প্রকাণ্ড ডানা মেলে শকুনরা উঠল সূর্যকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। ডেকে উঠে লেজের দিকে ঘুরে গেল শিয়ালরা। নদী বয়ে চলল জমিনের দিকে। পবিত্র স্থানের অমর্যাদাকারীরা সাবধান! সমস্ত দেবতার অভিশাপ নেমে আসবে তোমাদের ওপর!'

'অর্থহীন প্রলাপ নয় তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, অর্থহীন নয়! টাইটা কখনও অর্থহীন কথা বলে না। নিজেকে সে দুর্লভ প্রতিভা বলে দাবি করে, কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি একটু হয়তো ছিটগ্রস্ত। তাকে বুঝতে হলে তার চিন্তাধারা বুঝতে হবে। সে আমাদের জন্যে কিছু ধাঁধা রেখে গেছে, অর্থ বের করতে কিছুটা সময় তো লাগবেই। সেজন্যেই আমরা ক্যামেরা নিয়ে এসেছি। ছবি তোলার পর ওই পাথর থেকে ছাপ নেব আমরা। পরে যাতে স্টাডি করা যায়।'

ব্যাগ খুলে ক্যামেরা বের করল রানা। 'প্রথমে দুই রোল কালার ফটো তুলি, তারপর পোলারয়েড ব্যবহার করব–কালার ফটোগুলো ডেভলপ করতে সময় লাগবে, তার আগেই যাতে কাজ শুরু করতে পারি।' একে একে পিলারটার চারদিকেরই ফটো তুলল ও। ছবি তোলা শেষ হতে গ্রিল গেটের সামনে এসে তালাটা পরীক্ষা করল। 'এই তালাটা একটু জটিল, খুলতে হলে তালার ক্ষতি হতে পারে। তারমানে পুরোহিতরা জানবেন এখানে কেউ ঢুকছিল।'

'তাহলে ভেতরে ঢোকার দরকার নেই,' বলল নিমা। 'গ্রিলের এদিক থেকেই ছবি তুলুন।'

গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ক্যামেরা ঢোকাল রানা, বেশ কয়েকটা ফটো তুলল। 'এবার পোলারয়েড।' ক্যামেরা বদল করে আরেক দফা ছবি তোলা হলো। রানা প্রতিটি প্লেট এক্সপোজ করার পর নিমাকে দিল ডেভেলপমেন্ট চেক করার জন্যে।

প্রায় দু'ঘণ্টা পরিশ্রম করার পর ফটো তোলার পর্ব শেষ হলো। ক্যামেরা রেখে দিয়ে আর্ট পেপারের একটা রোল বের করল রানা। পিলারের গায়ে সাঁটা হলো কাগজটা, তারপর টেপ দিয়ে আটকানো হলো। দু'জন দু'দিক থেকে কাজ শুরু করল–রানা ওপর থেকে, নিমা নিচ থেকে। দু'জনের হাতে একটা করে কালো আর্ট ক্রেয়ন, খোদাই করা প্রতিটি হরফ ওই পেন্সিল দিয়ে ঘষে ফাঁকা কাগজে হুবহু তুলে নিল ওরা। 'টাইটা এখন যেখানেই থাকুক, আমি জানি আমাদের কাজ দেখে খিকখিক করে হাসছে সে,' বলল নিমা। 'ভাবছে, যতই চালাক হও তোমরা, আমার হেঁয়ালি ধরতে পারা এত সহজ কাজ নয়!'

ডিজাইনের আউটলাইন কাগজে তোলা পরিশ্রমসাপেক্ষ ও একঘেয়ে কাজ, তবু সময় যে কিভাবে বয়ে গেল দু'জনের কেউই টের পেল না। কাজ শেষ হতে নিমা জানতে চাইল, 'ক'টা বাজে বলুন তো?'

'ভোর চারটে। আসুন, জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলি।'

'আর একটা কাজ বাকি আছে,' বলে আর্ট পেপারের একটা কোণ ছিঁড়ে অলটার বা বেদির দিকে এগোল নিমা, ওখানে প্রধান পুরোহিতের মুকুটটা পড়ে রয়েছে। মুকুটটার মাঝখানে নীল সেরামিক সীলটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ও, তারপর আর্ট পেপারে ডানা ভাঙা বাজপাখির একটা ছাপ নিল। ইতিমধ্যে পিলারটাকে কাপড়ে মুড়ে দিয়েছে রানা, নিজেদের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিচ্ছে।

মিডল চেম্বারে ফিরে এসে তালাটা আবার লাগিয়ে দিল রানা। নিমা জিজ্ঞেস করল, 'মেইন দরজা দিয়ে বেরুব কিভাবে?'

খানিক চিন্তা করে রানা বলল, 'মিডল চেম্বার থেকে বেরুবার আরও রাস্তা থাকতে বাধ্য।' মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল ও। 'পুরোহিতরা মেইন গেট খুব কমই ব্যবহার করেন। এখান থেকে ওঁদের কোয়ার্টারে যাবার কোন না কোন পথ নিশ্চয়ই আছে···' হঠাৎ থেমে হাত তুলে দেখাল নিমাকে। '···ওদিকে তাকান!' দেয়াল ঘেঁষে একটা মসৃণ লম্বা দাগ দেখা গেল মেঝেতে, শত শত বছর ধরে আসা-যাওয়া করায় মেঝে ওখানে ক্ষয়েও গেছে। 'পর্দার দিকে

তাকান, ওদিকে, হাত দিয়ে ধরায় কেমন কালচে হয়ে গেছে।' দ্রুত এগিয়ে এসে পর্দাটা সরাতেই গোপন একটা দরজা দেখা গেল। 'যা ভেবেছি! পিছু নিন।'

পাথুরে একটা টানেল ধরে এগোল ওরা। ডান দিকে বাঁক নেয়ার পর সামনে ম্লান আলোর আভাস পাওয়া গেল। টর্চ নিভিয়ে ফেলল রানা।

বাসি খাবার আর ঘামের গন্ধ ঢুকল নাকে। সন্ন্যাসীদের একটা পাথুরে সেলকে পাশ কাটাল ওরা, দরজা নেই। টর্চের আলো ফেলতে দেখা গেল ভেতরটা ফাঁকা। কোন ফার্নিচার নেই, দেয়ালে শুধু একটা কাঠের ক্রস, তার নিচে চাকা লাগানো বিছানা। এরকম আরও দশ-বারোটা সেলকে পাশ কাটাল ওরা, একই রকম দেখতে। পরবর্তী বাঁক ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। মুখে সামান্য বাতাস লাগছে। কেউ কোথাও নেই দেখে আবার এগোল ওরা। কিছু দূর যাবার পর পিছন থেকে রানাকে আঁকড়ে ধরল নিমা।

'কি?' জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল রানা, নিমা ওর কাঁধে চাপ দেয়ায় চুপ করে গেল। তারপর শুনতে পেল আওয়াজটা। মানুষের গলা, গোলকধাঁধার ভেতর অস্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনি তুলছে।

তারপরই ভেসে এল বুকের রক্ত ছলকান একটা আর্তচিৎকার, যেন তীব্র ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে কেউ। সাবধানে এগোল ওরা, কারও চোখে ধরা পড়তে চায় না। তবে আওয়াজটা ক্রমশ বাড়ছে।

এতক্ষণে ওরা আলো দেখতে পাচ্ছে। প্যাসেজের একধারে একটা সেল থেকে বেরুচ্ছে আলোটা। আরও একটা রক্ত হিম করা আর্তচিৎকার শোনা গেল, এটা একটা নারীকণ্ঠ। চিৎকারটা প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে আসছে, প্যাসেজে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ওদেরকে।

'কি ঘটছে বলুন তো?' নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফিসফিস করল নিমা।

জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল রানা, নিমার হাত ধরে আবার এগোল। আলোকিত সেলের দরজাটাকে পাশ কাটাতে হবে ওদের। উল্টোদিকের দেয়ালে পিঠ ঘষে একটু একটু করে এগোচ্ছে রানা। ওর পাশেই রয়েছে নিমা, ওর একটা বাহু ধরে আছে।

সেলের ভেতর তাকাল ওরা, নারীকণ্ঠের চিৎকারটা আবার শুনতে পেল। তবে এবার চিৎকারের সঙ্গে মিশে আছে একটা পুরুষকণ্ঠ।

দৃশ্যটা ওদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। চাকা লাগানো বিছানার ওপর সম্পূর্ণ নগ্ন ওরা, ঘামে চকচকে দুটো শরীর এক হয়ে আছে। আরও অনেক কিছু দেখার ছিল, কিন্তু ঠেলে রানাকে সরিয়ে নিয়ে এল নিমা। 'থাক, দেখতে হবে না!' হিসহিস করে বলল ও।

প্যাসেজ থেকে ফাঁকা টেরেসে বেরিয়ে এল ওরা, থামল সিঁড়ির গোড়ায়, নীলনদের গন্ধ মেখে উঠে আসা তাজা বাতাসে ভরে নিল নিজেদের ফুসফুস। 'রুবি ওর কাছে চলে গেছে,' নরম সুরে ফিসফিস করল নিমা।

'অন্তত আজ রাতের জন্যে তো বটেই,' মন্তব্য করল রানা।

'না,' প্রতিবাদ করল নিমা। 'শুধু আজ রাতের জন্যে নয়, চিরকালের জন্যে। রুবি এখন শাফির মেয়েমানুষ।'

'কিন্তু স্বামী থাকতে অন্য পুরুষের কাছে যাওয়াটা কি ভাল? তোমার ধর্ম কি বলে?' কৌতুক করল রানা।

'উস্তাভ একটা মানুষ নাকি? ওটা তো একটা জানোয়ার, একটা পাষণ্ড,' জবাব দিল নিমা। 'আর ধর্মের কথা যদি বলেন, প্রচলিত ব্যাখ্যা আমি সব ক্ষেত্রে মানি না।'

দুই

রোদ ওঠার আগেই যে যার কুঁড়েতে পৌঁছুল ওরা।

বিকেলে রানার ঘুম ভাঙল উস্তাভের চেঁচামেচিতে। 'আমার বউ! আমার বউ! আপনি জানেন কোথায় গেছে আমার বউ? কোথাও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না!'

হাত দিয়ে চোখ রগড়ে বিছানার ওপর উঠে বসল রানা। 'আপনার বউ কোথায় আছে তার আমি কি জানি!'

'শালী আমার কালা কুত্তাটার সঙ্গে পালিয়েছে!' হুংকার ছাড়ল উস্তাভ। 'আপনি সব জানেন! বলুন কোথায় গেছে ওরা, তা না হলে খুনোখুনি কাণ্ড ঘটে যাবে!'

'মুখ সামলে কথা বলুন,' সাবধান করে দিল রানা।

'বউ তো নয়, বেশ্যা! অ্যালান শাফিকে ভাল খদ্দের ভেবে তার সঙ্গে পালিয়েছে! কিন্তু আমার নামও ভ্লাদিমির উস্তাভ! আমি ইন্টেলিজেন্স চীফ ছিলাম...' কি বলে ফেলছে বুঝতে পেরে থেমে গেল উস্তাভ। '...শাফির পেটে গুলি করব আমি, বেশ্যা মাগীটা তাকে মরতে দেখবে।' ছুটে রানার কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে গেল সে। গায়ে শার্ট চড়িয়ে তার পিছু নিল রানা।

নিজের কুঁড়েতে ফিরে একটা ব্যাগে কয়েকটা জিনিস ভরেছে উস্তাভ। এই মুহূর্তে হান্টিং রাইফেলে কার্ট্রিজ ঢোকাচ্ছে।

'গেছে যাকগে,' দরজা থেকে বলল রানা। 'ওদের পিছু নিলে আপনার বিপদ হতে পারে। শাফির সঙ্গে পঞ্চাশ জন গেরিলা আছে। আপনার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, বোঝা উচিত জোর করে কোন মেয়েকে ধরে রাখা যায় না।'

'কে ধরে রাখতে চায়? বেশ্যাটাকে আমি খুন করতে চাই!' চাবির গোছাটা রানার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিল উস্তাভ। 'সাফারি শেষ হয়ে গেছে, মিস্টার। ল্যান্ড ক্রুজারের চাবি রইল, নিজের চেষ্টায় আদ্দিস আবাবায় ফিরে যাবেন। বড় ট্রাকটা আমার জন্যে রেখে যাবেন। আদ্দিসে পৌঁছে আমার ট্র্যাকারকে ল্যান্ড ক্রুজারের চাবি বুঝিয়ে দেবেন। সাফারি বাতিল করায় আপনি কিছু টাকা ফেরত পাবেন, সেটা পরে আমি পাঠিয়ে দেব।'

রানার কোন যুক্তিই মানল না, কাঁধে ব্যাগ আর হাতে রাইফেল নিয়ে ক্যাম্প ত্যাগ করল উস্তাভ। নিজের কুঁড়েতে ফিরে আসছে রানা, দেখল দরজা দিয়ে মাথা

বের করে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে নিমা। 'সবই শুনলাম,' বলল সে। 'রুবিকে পেলে সত্যি মেরে ফেলবে। আমাদের কি কিছুই করার নেই?'

'না, নেই। আমাদের কোন সাহায্য ওদের লাগবেও না। যান, আবার শুয়ে পড়ুন।'

'কাল রাতের পোলারয়েড ছবিগুলো দেখছিলাম। টাইটা আমাদেরকে অঢেল দান করে গেছে। আসুন না, দেখবেন।'

ভেতরে ঢুকে রানা দেখল পোলারয়েড আর আর্ট পেপারে তোলা ছাপগুলো ক্যাম্প টেবিলে বিছিয়ে রেখেছে নিমা।

'আপনি যখন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন, আমি কিছু কিছু কাজ করেছি।' চারটে পোলারয়েড পাশাপাশি রাখল নিমা, ওগুলোর ওপর টেনে আনল বড় আকারের ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা। ভাঁজ করা পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে জিনিসটা, প্রফেশনাল ল্যান্ড সার্ভেয়ার'স মডেল। ওটার নিচে ফটোগ্রাফের প্রতিটি সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। 'টাইটা পাথরের প্রতিটি দিকের নাম রেখেছে–বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ আর শীত। এর মানে কি?'

'পৃষ্ঠা সংখ্যা?'

'ঠিক আমি যা ভেবেছি,' বলল নিমা। 'মিশরীয়রা বিশ্বাস করে বসন্ত হলো সমস্ত নতুন জীবনের সূচনা। প্যানেলগুলো কি নিয়মে পড়তে হবে সে-কথাই এখানে বলে দিচ্ছে টাইটা। এটা বসন্ত,' একটা ফটোগ্রাফ দেখাল ও।

'বুক অব দা ডেড থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এখানে,' বলল নিমা। 'পড়ছি, "অনাদি অনন্ত ও অন্ধকার সমুদ্রের ওপর মৃদুমন্দ প্রথম বায়ু আমি। আমি প্রথম সূর্যোদয়। আলোর প্রথম আভাস। ভোরের বাতাসে উড়ছি সাদা একটা পালক। আমি রা। সমস্ত বস্তুর শুরু আমি। বেঁচে থাকব চিরকাল। আমার ক্ষয় বা বিনাশ নেই"।' গ্লাস থেকে চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল নিমা। 'আপাতত এ-সব থাক, পরে ফিরে আসা যাবে। পরের অংশটুকু পড়া দরকার…তবে আপনি পড়লে ভাল হয়।' নিজের জায়গা রানাকে ছেড়ে দিল ও। 'পড়ার সময় আমার দিকে তাকাবেন না।'

ভুরু কুঁচকে রানা বলল, 'অনুবাদে আমি দক্ষ নই, অনেক বেশি সময় নেব। কেন, আপনার পড়তে অসুবিধে কি?'

'অসুবিধে আছে,' বলল নিমা, রানার দিকে তাকাচ্ছে না।

অগত্যা শুরু করল রানা। অনুবাদ খুব ধীরগতিতে এগোল, একটা কাগজে লেখার পর পড়ে শোনাল নিমাকে। পড়তে গিয়ে ওর নিজেরই কান যেন আগুন হয়ে গেল। 'দেবীর কন্যা তার মায়ের কাছে পৌঁছুনোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল। সিংহীর মত সগর্জনে মিলিত হবার জন্যে ছুটছে সে। পাহাড় থেকে লাফ দিল, দাঁতগুলো সাদা। সমস্ত বিশ্বের বেশ্যা সে। তার জননেন্দ্রিয় থেকে বিপুল স্রোত বেরিয়ে আসে। তার জননেন্দ্রিয় একদল কর্মীকে গ্রাস করেছে। তার শারীরিক ক্ষুধা পাথরমিস্ত্রী আর রাজমিস্ত্রীদের খেয়ে ফেলেছে। তার জননেন্দ্রিয় একটা অক্টোপাস, গিলে ফেলেছে একজন রাজাকে।'

নিমা আর রানা পরস্পরের দিকে তাকাতে পারছে না। তবে নিস্তব্ধতা ভাঙল

নিমাই, 'কি বুঝলেন?'

মাথা নাড়ল রানা।

'চলুন, আপনাকে একটা জিনিস দেখিয়ে আনি,' বলে হ্যাভারস্যাকে ফটোগ্রাফ আর আর্ট পেপার ভরে উঠে দাঁড়াল নিমা। 'আপনাকে বুট পরতে হবে। আমরা খানিক হাঁটতে বেরুব।'

এক ঘণ্টা পর ঝুলন্ত ব্রিজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ওদেরকে, ডানডেরা নদীর তীব্র স্রোতের অনেক ওপরে এদিক ওদিক দোল খাচ্ছে ব্রিজটা। 'নীল নদের দেবী হলো হাপি। তাহলে এই নদী তার কন্যা নয়, মায়ের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ছুটে চলেছে, লাফ দিচ্ছে পাহাড় থেকে, গর্জন করছে সিংহীর মত, ফেনায় সাদা দেখাচ্ছে তার দাঁত?' জিজ্ঞেস করল নিমা।

নদীর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল রানা, 'একদল কর্মীকে গ্রাস করেছে। পাথরমিস্ত্রী আর রাজমিস্ত্রীদের খেয়ে ফেলেছে।'

'ফারাও মামোস একজন গড বা কিং। নদী একজন গডকে গিলে ফেলেছে…পাথুরে খিলান সহ।' রানার মতই উত্তেজিত নিমা। 'খাদের ভেতর পাঁচিলে আপনি ওই কুলুঙ্গিগুলো দেখেছেন বলেই সম্পর্কটা ধরতে পেরেছি আমি। রানা, ওখানে আবার আমাদের যাওয়া দরকার। খোদাই করা ডিজাইনটা দেখতে হবে।'

'সেজন্যে প্রস্তুতি দরকার,' বলল রানা। 'রশি কাটতে হবে, একটা পুলি সিস্টেম দরকার হবে। খালিদ সহ সবার সাহায্যে লাগবে।'

'আপনি প্রস্তুতি নিন, সেই ফাঁকে পাথরটার অনুবাদ শেষ করি আমি…' হঠাৎ থেমে গিয়ে আকাশের দিকে তাকাল নিমা। 'শুনুন!'

কান পাতল রানা, নদীর কলকল ছলছল ছাপিয়ে জেগে উঠল রোটরের আওয়াজ। 'প্রক্সি দেখছি পিছু ছাড়েনি! আসুন!' নিমার হাত ধরে ছুটল ও, ব্রিজ থেকে নেমে সৈকতে চলে এল। ব্রিজের নিচে সাদা বালিতে বসে থাকল ওরা, বোল্ডারের আড়াল থাকায় আশা করছে হেলিকপ্টার থেকে ওদেরকে দেখা যাবে না।

লালচে পাহাড় প্রাচীরের ওদিকটায় চক্কর দিল জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টার। ওদেরকে পাইলট দেখতে পায়নি, ঘুরে গিয়ে খাদের এদিক থেকে ওদিক টহল দিতে শুরু করল। তারপর হঠাৎ এঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল, 'কপ্টারের গতি কমে আসছে। 'পাহাড়ে কোথাও নামছে,' ব্রিজের তলা থেকে ক্রল করে বেরুবার সময় বলল রানা। 'ওদের এই উঁকি-ঝুঁকি মারা আমার ভাল ঠেকছে না।'

'খুব একটা চিন্তার কিছু আছে বলে মনে করি না,' বলল নিমা। 'চাচা হাসলানের খুনীদের সঙ্গে প্রক্সির যদি কোন সম্পর্ক থাকে, তার ব্যবস্থা পরে এক সময় করা যাবে।' প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছেটা আগের মতই প্রবল নিমার, তবে হাতের জরুরী কাজগুলো প্রথমে সারতে চাইছে। 'ওদের চেয়ে এগিয়ে আছি আমরা, তাই না? মঠ বা শিলালিপির তাৎপর্য সম্পর্কে ওদের এখনও কোন ধারণা নেই।'

'চলুন ক্যাম্পে ফিরি,' বলল রানা। 'আমি চাই না খাদের কাছাকাছি ওরা

আমাদেরকে আবার ঘুরঘুর করতে দেখে ফেলে।'

গ্যানট্রি বা মোবাইল একটা ক্রেন তৈরি করল রানা, ওকে সাহায্য করল ট্র্যাকার আর স্কিনাররা। ব্লক আর ট্যাকল নেই, তার বদলে ব্যবহার করা হলো কাঠের পোল। পিং শীট তৈরির জন্যে কুকিং হাট থেকে কেটে আনল এক টুকরো ক্যানভাস, সেটার চার কোণে চারটে ফুটো করে রশি বাঁধা হলো। প্রস্তুতি শেষ করতে বিকেল হয়ে গেল, নিমা বাদে বাকি সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা।

গ্যানট্রি আর রশির কুণ্ডলী নিয়ে সেই স্পটে পৌঁছুল ওরা, পাহাড়ের কিনারা থেকে যেখানে নিচে লাফ দিয়েছিল ডিক-ডিক। ওখান থেকে রওনা হলো ভাটির দিকে, পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা ধরে এগোচ্ছে। এদিকে ঝোপ খুব ঘন, ম্যাচিট দিয়ে কাটার জন্যে মাঝে মধ্যে থামতে হলো। জলপ্রপাতের আওয়াজ পথ দেখাল রানাকে। ভাটির দিকে যতই এগোল, ততই বাড়ছে শব্দটা। তারপর একসময় পানির গর্জনে পায়ের নিচে কাঁপতে শুরু করল পাথর। খানিক পর কিনারায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে ঝুঁকল রানা, জলোচ্ছ্বাসের সাদা ফেনা দেখে খালিদকে বলল, 'এই জায়গাই।' তারপর ব্যাখ্যা করল ঠিক কি চাইছে ও।

গ্যানট্রি ঠিক কোথায় সেট করা দরকার জানার জন্যে ক্যানভাস পিং সীটে বসল রানা, খালিদ বাহিনীকে বলল, 'কিনারা থেকে বিশ ফুট নিচে নামাও আমাকে।' ও জানে, বিশ ফুট নিচ থেকে শুরু হয়েছে ওভারহ্যাঙ বা ঝুল-পাথর। ওই পয়েন্ট পর্যন্ত নাইলন রশি পাথরে ঘষা খাবে না, তবে ফুলে থাকা পাহাড়-প্রাচীরের গা চারদিকে অনেকটাই দেখতে পাওয়া যাবে।

দেড়শো ফুট নিচে নদীর পাথুরে গহ্বর, পিছন ফিরে শূন্যে ঝুলছে রানা, পাথরের গায়ে দুই সারি কুলুঙ্গি প্রায় পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছে। তবে পাঁচিলের গায়ে খোদাই করা ডিজাইন ফুলে থাকা পাথরের আড়ালে থেকে গেল। খালিদকে সংকেত দিতে পিং সীট ওপরে তুলে নিল ওরা।

'গ্যানট্রি আরও নিচের দিকে সেট করতে হবে।' জিনিস-পত্র তুলে নিয়ে ঝোপ ভেঙে আবার এগোল ওরা, পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা ধরে। 'দাঁড়াও!' হঠাৎ চিৎকার করল রানা। 'ঝোপগুলো এদিকে খাটো কেন?' পরীক্ষা করে দেখার পর ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। পাহাড়-প্রাচীরের এদিকের কিনারা ক্ষয়ে গেছে, ফলে পাথুরে জমিন পিছনের চেয়ে অনেক বেশি ঢালু। রানা ধারণা করল; সম্ভবত এই জায়গা থেকে প্রাচীন মাচা নিচে নামানো হয়েছিল। 'আর সামনে এগোবার দরকার নেই। এখানেই গ্যানট্রি সেট করব আমরা।'

ঝোপ-ঝাড় কেটে জায়গাটা পরিষ্কার করতে হলো। গ্যানট্রি সেট করার পর হাতে আর সময় থাকল না, সন্ধে হয়ে আসছে। 'আজকের মত থাক। এখন চলো, কাল সকালে ফিরে আসব,' বলল রানা।

পরদিন সকালে আবার সেট করা গ্যানট্রির কাছে পৌঁছুল ওরা। ঢালু জমিন একটা প্লাটফর্মে এসে শেষ হয়েছে, নিরেট পাথুরে প্লাটফর্মের কিনারায় খাদের ঠোঁট। ঘুরে ফিরে দেখে নিমা মন্তব্য করল, 'নিশ্চয় করে বলা কঠিন, তবে বোধহয় আপনার ধারণাই ঠিক–মানুষের তৈরি হতে পারে।'

স্লিং সীটে বসে সংকেত দিল রানা, খালিদ বাহিনী ওকে খাদে নামাতে শুরু করল। ওর পরনে শর্টস আর টেনিস শু, গায়ে টি-শার্ট। পিং সীটে ঝুলছে রানা, খাদের খাড়া গা থেকে যথেষ্ট দূরে। নামার শুরুতেই দেখতে পেল, কুলুঙ্গি সারির সঙ্গে একই লাইনে রয়েছে ও। পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে তৈরি বৃত্তাকার ডিজাইনটা ওর সামনে অর্থাৎ একই লেভেলে চলে এল, তবে ওর কাছ থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে ওটা, তার ওপর শ্যাওলা পড়ে পাথরের রঙ বদলে গেছে, ফলে ঠিক বোঝা গেল না ডিজাইনটা কৃত্রিম কিনা। খালিদ বাহিনী রশি ছাড়ছে, ডিজাইনটাকে ওপরে রেখে নিচে নামছে স্লিং সীট।

পানির সারফেসে পৌঁছুল স্লিং সীট, নদীতে নেমে পড়ল রানা। এরপর নিমা নামবে।

ডিজাইনটার সঙ্গে একই লেভেলে পৌঁছে নিমা সংকেত দিল, স্থির হয়ে গেল স্লিং সীট। বুকে ঝুলে থাকা বিনকিউলারটা চোখে তুলল ও। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপরই বিনকিউলার ছেড়ে দিল, গলা চিরে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণ উল্লাসধ্বনি। একশো ফুট নিচ থেকে চিৎকারটা স্পষ্ট শুনতে পেল রানা। উত্তেজনায় পা ছুঁড়ছে নিমা, রানার উদ্দেশে হাত নাড়ছে।

হেসে উঠল রানা, হাতছানি দিয়ে ওকে নিচে নেমে আসতে বলল। সংকেত পেয়ে আবার রশি ছাড়তে শুরু করল খালিদ বাহিনী।

'কি দেখলেন? মানুষের তৈরি? লিপি? পড়তে পেরেছেন?' নিমা পানির কাছাকাছি নেমে আসতে রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল রানা।

'ইউ ওয়্যার রাইট, ইউ ওয়ান্ডারফুল ম্যান!' উল্লাসে অধীর নিমা। 'আপনার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর–হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! টাইটা এখানেও তার সই রেখে গেছে, ডানা ভাঙা বাজপাখি!'

'মার্ভেলাস!'

'টাইটা যে এখানে এসেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল, রানা। কুলুঙ্গিগুলো তৈরি করার জন্যে একটা মাচায় দাঁড়াতে হয়েছিল তাকে। আমাদের প্রথম অনুমানই ঠিক। আপনি যে ফোকরে হাত রেখেছেন, ওটা খাদে নামার জন্যে তার মইয়েরই একটা অংশ।'

'বুঝলাম, কিন্তু কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এখানে নামার কি দরকার ছিল তার? খোঁড়াখুঁড়ি বা নির্মাণ কাজের কোন চিহ্নই তো দেখছি না।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে নিমা জিজ্ঞেস করল, 'পানির নিচে ফোকরগুলো আছে কিনা দেখেছেন?'

'না। সারফেসের নিচে পাথর কাটা সম্ভব নাকি!'

'তবু দেখুন!'

ফোকরটা থেকে হাত না সরিয়েই পা ও শরীর পানির ভেতর ডোবাল রানা। পানির নিচে অদৃশ্য হলো মাথা, পা দিয়ে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে ফোকর খুঁজছে। অকস্মাৎ ঝাঁকি খেয়ে পানির ওপর মাথা তুলল, চেহারা দেখে মনে হলো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। 'সত্যি আছে! পানির নিচে আরেকটা ফোকর আছে!'

'একটা? আমি তো বলি, অনেকগুলো!' তারপর বিনয়ে বিগলিত হবার ভান

করল নিমা। 'প্লীজ, একবার ডাইভ দিয়ে দেখুন না! লজেন্স খাওয়াব!'

বড় করে শ্বাস টেনে বাতাসে বুক ভরে নিল রানা, তারপর ডুব দিল পানিতে। সারফেসের নিচে প্রথম ফোকরটা হাত দিয়ে ছুঁলো, তারপর নেমে এল আরও নিচে। দ্বিতীয়টা পাওয়া গেল ছ'ফুট দূরে, বাকিগুলোর মতই। এভাবে যত নামছে রানা ততই একের পর এক ফোকর পাচ্ছে। চারটে ফোকর, তারমানে সারফেস থেকে চব্বিশ ফুট নেমে এসেছে ও। ভোঁ-ভোঁ করছে কান দুটো।

আরও নামছে রানা। পঞ্চম ফোকরকে পাশ কাটাল। ফুসফুসের বাতাসে চাপ বাড়ছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে, যদিও পানি এখানে গাঢ় আর ঘোলা। সরাসরি সামনে পাহাড়-প্রাচীরের গা-ই শুধু দেখতে পাচ্ছে। ছ'নম্বর ফোকরটা চোখে পড়তে ধরে ফেলল কিনারা। ইতস্তত করছে রানা।

সারফেস থেকে ছত্রিশ ফুট নেমেছে অথচ এখনও নদীর তলায় পৌছুতে পারেনি। সিদ্ধান্ত নিল, আরও ছ'ফুট নামবে, তারপর উঠে যাবে ওপরে। বাতাসের অভাবে ব্যথা শুরু হয়েছে বুকে।

নামছে, সাত নম্বর ফোকরটা চোখে পড়ল। ভাবল, আশ্চর্য, নদীর একেবারে তলা পর্যন্ত আছে এগুলো! কাজটা টাইটা করল কিভাবে! ওদের তো ডাইভিং ইকুইপমেন্ট ছিল না! শেষ ফোকরটা ধরে চিন্তা করছে রানা, আরও নিচে নামার ঝুঁকি নেবে কিনা। ফিজিকাল লিমিটের প্রায় শেষ সীমায় পৌছে গেছে, শরীরের পেশী কাঁপতে শুরু করেছে। ঠিক আছে, আর মাত্র একটা!

বিপদ সংকেত পেতে শুরু করেছে রানা। মাথার ভেতরটা হালকা লাগছে। পানির চাপে কুঁচকে যাচ্ছে, ভাঁজ খাচ্ছে চামড়া। এই সময় আঙুলে ঠেকল আট নম্বর ফোকর। আর নয়, এবার ওপরে উঠতেই হয়। হঠাৎ নদীর তলায় পা লাগল। পানিতে পা ছুঁড়ে ওপরে উঠতে চাইছিল, কিছু একটা ধরে ফেলল ওগুলোকে, সজোরে টেনে নিল পাথুরে পাঁচিলের দিকে। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। 'অক্টোপাস! টাইটার অক্টোপাস। একজন রাজাকে গিলে ফেলেছে!' আতঙ্কে এই সব চিন্তা করছে রানা। পা ছুঁড়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। যেন কোন জলদানব টেনে রেখেছে পা দুটোকে। নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় লাগল, শরীরটা সেঁটে আছে পাঁচিলের গায়ে। তারপর ভাবল, অক্সিজেনের অভাবে হ্যালুসিনেশনের শিকার হয়ে পড়েছে ও। আসলে কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারল এতক্ষণে।

অক্টোপাস নয়, ওয়াটার প্রেশার। পাথরের গায়ে সরু একটা ফাটল আছে, আন্ডারওয়াটার টানেলের মুখ। শ্যাফটের ভেতর তীব্রবেগে পানি ঢুকছে, সেই স্রোতে আটকা পড়েছে ওর পা, তবে শরীরের ওপরের অংশে এখনও ওই স্রোতের কোন প্রভাব পড়েনি। রানা টের পাচ্ছে ফাটলটার নির্দিষ্ট একটা আকৃতি আছে, রাজমিস্ত্রীর তৈরি চৌকো লিনটেল-এর মত। এই লিনটেলই ওকে ভেতরে টেনে নিতে চাইছে। হাত দুটো ওপরের পাঁচিলে মেলে সমস্ত শক্তি দিয়ে টানটা থেকে পা দুটোকে মুক্ত করতে চাইছে রানা, কিন্তু আঙুলগুলো ধরার মত কিছু পাচ্ছে না, মসৃণ আর শ্যাওলায় মোড়া পিচ্ছিল পাথরে হড়কে যাচ্ছে হাত। বাঁকা হয়ে উপড়ে আসছে নখগুলো।

তারপর হঠাৎ সিঙ্ক-হোলের ওপর শেষ ফোকরটার নাগাল পেয়ে গেল রানা। দু'হাতে ফোকরের কিনারা ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করল পা দুটোকে ফাটল থেকে বের করে আনতে। রিজার্ভ শক্তিও ফুরিয়ে এসেছে, দুই হাতের পেশী কাঁপছে থরথর করে, মাংসের নিচে থেকে ফুলে উঠল ঘাড়ের রগগুলো, মনে হলো মাথাটা বিস্ফোরিত হবে। একেবারে লাভ হলো না তা নয়, সিঙ্ক-হোলের ভেতর শরীরের ঢুকে যাওয়াটা বন্ধ হয়েছে।

ফুসফুসের সব বাতাস খরচ হয়ে গেছে। বড়জোর আর একবার চেষ্টা করতে পারবে রানা। গাঢ় মেঘের মত আকৃতি দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে, নেতিয়ে পড়ে বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছেটা অদম্য হয়ে উঠল। কোত্থেকে এত শক্তি পেল বলতে পারবে না, পা দুটোকে টানছে তো টানছেই। মাথার ভেতরটা অন্ধকার ছিল, হঠাৎ বিভিন্ন রঙের বিস্ফোরণ ঘটল সেখানে, চোখ দুটোকে ধাঁধিয়ে দিল। তবু ঢিল দেয়নি রানা, টেনে যাচ্ছে। অনুভব করল পা দুটো বেরিয়ে আসছে সিঙ্ক-হোল থেকে, স্রোতের টান দুর্বল হয়ে পড়ছে। শক্তির উৎস জানা নেই, নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত করার জন্যে আরও জোর খাটাল ও।

হঠাৎ করেই ছাড়া পেল রানা, সারফেসের দিকে উঠে আসছে। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, আবার অন্ধকার হয়ে গেল মাথার ভেতরটা, কানে গর্জন করছে জলপ্রপাতের মত বিকট শব্দ। নিঃশেষ হয়ে গেছে ও। জানে-না কোথায় রয়েছে, সারফেসে পৌছুতে হলে আর কতটুকু উঠতে হবে। একবার মনে হলো উঠছে না, ডুবে যাচ্ছে। শেষ হয়ে গেছে ও।

পানির ওপর ওঠার পরও বুঝতে পারেনি যে উঠেছে। এত শক্তি নেই যে পানি থেকে মুখ তুলে শ্বাস নেবে। পানিতে মুখ দিয়ে যেন একটা লাশ ভাসছে। তারপর অনুভব করল মাথার চুল ধরে টান দিল নিমা, ঠাণ্ডা তাজা বাতাসের স্পর্শ পেল মুখে।

'রানা! শ্বাস নিন!' চিৎকার করছে নিমা। 'শ্বাস নিন, রানা, শ্বাস নিন!'

মুখ খুলে পানি ছাড়ল রানা, তারপর বিষম খেলো।

'আপনি বেঁচে আছেন! ওহ্, থ্যাঙ্ক গড! এত দেরি করছেন্ দেখে ভাবলাম আপনাকে বুঝি হারালাম!' কেঁদে ফেলল নিমা।

খাদ থেকে প্রথমে রানাকে তোলা হলো, তারপর নিমাকে। রানার নির্দেশে গ্যানট্রি খুলে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রাখা হলো, হেলিকপ্টার থেকে জ্যাক রাফেল যাতে দেখতে না পায়। কাঁটাঝোপের ছায়ায় শুয়ে এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিল রানা, প্রতিটি মুহূর্ত ওর সেবায় ব্যস্ত থাকল নিমা। মাথার ব্যথাটা কোনমতে কমছে না, নিঃশ্বাস ফেলার সময় বুকেও ব্যথা অনুভব করছে ও। এক সময় ওকে ধরে দাঁড় করাল নিমা। ক্যাম্পে ফেরার সময় আড়ষ্ট একজন বুড়োর মত লাগল রানাকে, সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যথা। ক্যাম্পে ফিরে ওকে ওর কুঁড়েতে শুইয়ে দিল নিমা, শারি টাঙাল, আগুনের মত গরম এক মগ চায়ের সঙ্গে দুটো অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খাওয়াল।

আরও এক মগ চা চাইল রানা। সেটা খালি হতে নিমা জিজ্ঞেস করল, "এখন

একটু ভাল লাগছে?'

'বোধহয় বাঁচব,' বলে হাসল রানা।

'মুখের রঙ ফিরে এসেছে,' বলল নিমা, চোখে-মুখে তৃপ্তির ছাপ। 'যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন না!'

'আপনার মনোযোগ কাড়ার আর কোন উপায় ছিল?'

'এখন যখন জানেন যে বাঁচবেন, বলে ফেলুন কি ঘটেছিল।'

সিঙ্ক-হোলটার বর্ণনা দিল রানা। ও থামতে নিমা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর বলল, 'সারফেস থেকে পঞ্চাশ ফুট নিচে ফোকর তৈরি করেছে টাইটা?' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিভাবে, রানা?'

'চার হাজার বছর আগে ওয়াটারলেভেল আরও হয়তো নিচে ছিল। হয়তো খরায় শুকিয়ে গিয়েছিল নদীর তলা।'

'কিন্তু তাহলে মাচা দরকার হবে কেন? তাছাড়া, শুকনো নদী খাদের অন্য যে-কোন জায়গার মতই, তাই না? না, দুর্গম বলেই এই স্পটটা বেছে নিয়েছিল টাইটা। অন্তত এটা অন্যতম কারণ।'

'আপনার সঙ্গে আমি একমত।'

'তাহলে সারফেসের নিচে ফোকরগুলো টাইটা তৈরি করল কিভাবে?' হাসল নিমা। 'জানি একই প্রশ্ন অযথা রিপিট করছি। ঠিক আছে, এ প্রসঙ্গ আপাতত থাক। এবার সিঙ্ক-হোলটার কথা বলুন। সাইজটা কি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'অন্ধকারে মাপার সুযোগ হয়নি। দুই কি তিন ফুট হবে।'

'দু'সারি ফোকরের ঠিক মাঝখানে ফাটলটা?'

'না, একটু একপাশে। তবে নদীর একেবারে তলায়। চৌকো বলে মনে হয়েছে, তবে তা না-ও হতে পারে। জান বাঁচাতে ব্যস্ত ছিলাম, অতশত খেয়াল করিনি।'

'মানুষের তৈরি?' বিড়বিড় করল নিমা, দরজার দিকে এগোল। 'নোট আর ফটোগ্রাফগুলো নিয়ে আসি।'

ফিরে এসে বিছানার পাশে মেঝেতে সুখাসনে বসল নিমা, কাগজ-পত্র ছড়িয়ে রাখল নিজের সামনে। মশারি থেকে মাথা বের করে ওর দিকে তাকাল রানা।

'শিলালিপির বসন্ত পর্বের বাকি অংশটুকু ডিসাইফার করেছি আমি।' নোটবুকটা খুলে নিজের হাতের লেখাটুকু দেখাল নিমা। 'এগুলো প্রাথমিক নোট, এখানে সেখানে কিছু প্রশ্ন চিহ্ন আছে। কোথাও অনুবাদ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারিনি, কোথাও হয়তো টাইটা নতুন সংকেত ব্যবহার করেছে। এগুলো নিয়ে পরে মাথা ঘামাব। সবুজ কালিতে লেখা এগুলো উদ্ধৃতি, বুক অভ দ্য ডেড থেকে নেয়া। খানিকটা পড়ি। "বিশ্বকে আঁকা হয়েছে বৃত্তাকারে, সূর্য দেবতার চাকতি, রা। মানুষের জীবন একটা বৃত্ত, শুরু জরায়ুতে, শেষ সমাধিতে"। আরও পড়া যায়, পড়ছি না। হলুদ কালিতে এই যে লেখাগুলো দেখছেন, এগুলো বুক অভ দা ডেড বা অন্য কোন উৎস থেকে এসেছে বলে মনে হয়নি আমার। এগুলো টাইটারই লেখা বলে আমার ধারণা। বিশেষ করে এই প্যারাগ্রাফটার ওপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। পড়ছি—"দেবীর কন্যা গর্ভবতী হলো। সে

গর্ভবতী হলো এমন একজনের দ্বারা যার কোন শুক্র নেই। সে তার যমজ বোনকেও নিজের ভেতর ধারণ করছে। তার নিজের জরায়ুতে চিরকালের জন্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে ভ্রূণটা। তার যমজ কোনদিনই জন্ম নেবে না। রা-র আলো কোনদিনই তার দেখা হবে না। চিরকাল অন্ধকারেই কাটাতে হবে তাকে। বোনের জরায়ুতে বোন, তার বর তাকে চিরকালীন বৈবাহিক সূত্রে বাঁধতে চাইল। জন্ম না হওয়া যমজ বোন হলো দেবতার কনে, যিনি কিনা একজন মানুষ। ওদের নিয়তি পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ওরা অনন্তকাল বাঁচবে। ওদের বিনাশ নেই"।'

নোট বুক থেকে মুখ তুলল নিমা। 'আমরা আগেই একমত হয়েছি, দেবীর কন্যা মানে হলো ডানডেরা নদী। গড বা দেবতা এক সময় মানুষ ছিলেন, তারমানে পরে তিনি ফারাও হন। দেবতা হিসেবে বরণ করে একমাত্র মামোসকেই মিশরের সিংহাসনে তোলা হয়। তার আগে তিনি একজন মানুষ ছিলেন।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'শুক্রহীন ব্যক্তি টাইটা নিজেই, বোঝা যায়। সে যে খোজা পুরুষ, এ-কথা বারবার বলেছে। তবে রহস্যময় যমজ বোন সম্পর্কে কি ভাবছেন আপনি?'

'নদীর যমজ স্বভাবতই একটা শাখা হবে, কিংবা স্রোতের আরেকটা ধারা, তাই না?'

'আপনি বলতে চাইছেন সিঙ্ক-হোল ডানডেরার যমজ বোন। খাদের তলায় ওটা কোনদিনই রা-র আলো দেখবে না। টাইটা, যার শুক্র নেই, পিতৃত্ব দাবি করছে, তারমানে বলতে চাইছে সে-ই আসলে আর্কিটেক্ট।'

'ঠিক তাই। আর নদীর যমজ বোনের সঙ্গে ফারাও মামোসের বিয়ে দিয়েছে, যে বিয়ে অনন্তকাল স্থায়ী হবে। সব মিলিয়ে দেখার পর আমি উপসংহারে পৌঁচেছি, ওই সিঙ্ক-হোলের ভেতরটা দেখার সুযোগ না পেলে ফারাও মামোসের সমাধির লোকেশন কোনদিনই আমরা খুঁজে পাব না।'

'কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব বলে আপনার ধারণা?'

কাঁধ ঝাঁকাল নিমা। 'আমি এঞ্জিনিয়ার নই, রানা। কিভাবে কি করবেন, আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম। আমি শুধু জানি, টাইটা ওই সিঙ্ক-হোলে কাজ করেছে। সে পারলে, চার হাজার বছর পর আজ আপনারও পারা উচিত।'

'কিন্তু টাইটার সঙ্গে কি আমার তুলনা চলে? টাইটা ছিল একটা প্রতিভা। আমি পণ্ডিত, এ-কথা বারবার বলছে সে। আর আমি? আমি তো সামান্য একজন...'

'আপনি যা-ই হোন, আমি জানি আমাকে আপনি হতাশ করবেন না!' মুচকি হেসে বলল নিমা।

তিন

উস্তাভ আর রুবি ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাবার পর গোপনীয়তা বজায় রাখার আর

কোন প্রয়োজন থাকল না, এখন আর নিমার কুঁড়েতে চুপিচুপি ঢুকে ফিসফিস করে কথা বলতে হয় না রানাকে। যে কুঁড়েতে বসে খাওয়াদাওয়া সারত ওরা সেটাকে বানানো হলো ওদের নতুন হেডকোয়ার্টার। ক্যাম্প স্টাফকে দিয়ে বড় একটা টেবিল তৈরি করাল রানা, তাতে জড়ো করা হলো স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ সহ অন্যান্য জিনিস-পত্র, ইতিমধ্যে ওরা যা সংগ্রহ করতে পেরেছে। কিচেন থেকে নিয়মিত চা যোগান দিয়ে গেল শেফ, কাগজ-পত্রের ওপর হুমড়ি খেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিল ওরা।

একটা ব্যাপারে একমত হলো দু'জনেই, সিঙ্ক-হোলটা মানুষের অর্থাৎ টাইটার তৈরি কিনা বুঝতে হলে উপযুক্ত ইকুইপমেন্ট নিয়ে আবার নামতে হবে ওখানে। তারমানে স্কুবা দরকার হবে। নিমা জানাল, চাচা হাসলানের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে লোহিত সাগরে অ্যাকুয়াল্যাঙ ব্যবহার করেছে সে, তবে তাকে এক্সপার্ট বলা যাবে না।

শুধু ইকুইপমেন্টই নয়, এক্সপার্টদের সাহায্যও দরকার হবে। অপারেশনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করার জন্যে এ-সব নিয়ে ওদেরকে এলাকায় আবার ফিরে আসতে হবে যথাসম্ভব দ্রুত, বর্ষা মরশুম শুরু হয়ে যাবার আগেই।

ঠিক হলো সিঙ্ক-হোলটা সম্পর্কে আরও খানিক পরিষ্কার ধারণা পাবার পর রওনা হবে ওরা, ফিরে এসে যাতে সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করা যায়।

সিঙ্ক-হোল প্রসঙ্গে নিজের ধারণার কথা বলল রানা, 'যা ঢোকে তা বেরিয়েও আসে, যেমন ওপরে কিছু উঠলে সেটা নেমে আসতেও বাধ্য। ফাটলটার ভেতর এত জোরে পানি ঢুকছে, নিশ্চয়ই কোথাও দিয়ে বেরুচ্ছেও সেই পানি, তাই না?'

'বলে যান।'

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার। নদীর তলা থেকে ওই সিঙ্ক-হোলে ঢোকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। পানির প্রেশার ওখানে ভয়ঙ্কর। তবে আমরা যদি আউটলেটটা খুঁজে পাই, সেদিক থেকে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'একটা সম্ভাবনা বটে।' চেহারা দেখে মনে হলো রানার বক্তব্য প্রভাবিত করেছে নিমাকে। একটা স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ টেনে নিল ও। মঠটা চিহ্নিত করে ফটোগ্রাফের ওপর একটা বৃত্ত এঁকেছে রানা। গহ্বরের ভেতর নদীর কোর্সও চিহ্নিত করেছে, যদিও খাদটা এত সরু আর ঘন ঝোপে এমনভাবে ঢাকা যে ছোট স্কেলের ছবিতে স্পষ্ট দেখা যায় না, হাই-পাওয়ারড ম্যাগনিফাইং লেন্স ব্যবহার করা সত্ত্বেও। 'এই পয়েন্টে নদীটা গহ্বরে ঢুকছে,' আঙুল দিয়ে দেখাল নিমা। 'আর এটা হলো সাইড ভ্যালি, যেটা বেয়ে ট্রেইল ঘুরপথে এগিয়েছে। ঠিক আছে?'

'তা আছে,' বলল রানা, 'কিন্তু আপনি আসলে বলতে চাইছেন কি?'

'এখানে আসার পথে আমরা মন্তব্য করেছিলাম এই উপত্যকা সম্ভরত এক সময় ডানভেরা নদীর আদি কোর্স ছিল, পরে নদীটা গহ্বরের ভেতর আলাদা একটা তলা তৈরি করে নেয়।'

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'এই পয়েন্টের জমিন নীলনর্দের দিকে খুব বেশি ঢালু, তাই না? এবার বলুন, আপনার কি মনে আছে, শুকনো উপত্যকা বেয়ে নামার সময় আরেকটা ছোট

প্রবাহ দেখেছিলাম আমরা? মনে হয়েছিল প্রবাহটা উপত্যকার পুবদিকের কোথাও থেকে বেরিয়েছে?'

'কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি,' বলল রানা। 'আপনার ধারণা সিঙ্ক-হোল দিয়ে ঢুকে ওই পথে বেরিয়েছে স্রোতটা।' দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে অসুবিধে কি?'

ক্যামেরা ব্যাগ আর হালকা ডে-প্যাক নেয়ার জন্যে নিজের কুঁড়েতে চলে গেল রানা, ফিরে এসে দেখল নিমা যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে, তবে ইতিমধ্যে ওর একজন সঙ্গী জুটেছে।

পথে ওদের সামনে থাকল বাটি, এগোচ্ছে নাচতে নাচতে, সরু কাঠির মত পায়ের চারপাশে আলখেল্লার ঝুল ফুলে ফুলে উঠছে। নৃত্যের সঙ্গে গীতও গাইছে ছেলেটা। অ্যামহারিক ভাষায় তার তেমন দখল নেই, তবে যীশু আর সেইন্টদের নিয়ে যত গান আছে তার প্রায় সবই মুখস্থ। কয়েক মিনিট পরপর পিছন ফিরে তাকাচ্ছে সে, দেখে নিচ্ছে নিমা ঠিকমত আসছে কিনা। আগুনের মত গরম রোদের ভেতর উপত্যকার ঢাল বেয়ে ওঠা অত্যন্ত ক্লান্তিকর, ওরা দু'জন ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠল। কিন্তু বাটিকে যেন পরিশ্রম বা রোদ স্পর্শই করছে না, আগের মতই হাসি-খুশি আর অক্লান্ত লাগছে তাকে।

ঝর্ণা বা প্রবাহটা উপত্যকার যেখানে বেরিয়েছে সেখানে পৌঁছে কয়েকটা অ্যাকেইশা গাছের ছায়ায় বসে পড়ল ওরা। বিশ্রাম নেয়ার সময় চোখে বিনকিউলার তুলে উপত্যকার পাশটা পরীক্ষা করছে রানা। 'ঘন ঝোপে কিছুই দেখা যাচ্ছে না,' খানিক পর মন্তব্য করল। 'দুঃখিত, পায়ে হেঁটেই উৎসের সন্ধান করতে হবে।'

আবার হাঁটা শুরু হলো। উপত্যকার পাশ বেয়ে উঠে যাচ্ছে, মাথার ওপর সূর্য। জলপ্রবাহের কিনারা ধরে হাঁটছে ওরা। কয়েক জায়গায় জমা হয়েছে ঝর্ণার পানি, সেখান থেকে খুদে জলপ্রপাত লাফ দিয়েছে নিচের দিকে। পাড়ে ঘন ঝোপ; শিকড় যেখানে পানির নাগাল পেয়েছে সেখানে ওগুলো তাজা আর গাঢ় সবুজ। পানির ওপর কালো আর হলুদ প্রজাপতি মেঘের মত উড়ছে। সবুজ শ্যাওলা মোড়া পাথরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সাদা-কালো একটা খঞ্জনা। ঢালের অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে ছোট একটা জলাশয়ের পাশে বিশ্রাম নিতে বসল ওরা। বিরক্ত করছে দেখে হাতের হ্যাট দিয়ে একটা ফড়িংকে বাড়ি মারল রানা, ছিটকে সেটা ঝর্ণার পানিতে পড়ল। দুর্বল ভঙ্গিতে পা ছুঁড়ছে ওটা, স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে নিচের দিকে, এই সময় পানির ভেতর থেকে গাঢ় একটা ছায়া মাথাচাড়া দিল। আলোড়ন উঠল পানিতে, আয়নার মত রুপালি পেট ঝিক করে উঠল, অদৃশ্য হয়ে গেল ফড়িংটা।

'মাছ! কম করেও দশ পাউন্ড! ইস, রডটা আনিনি!'

ঝর্ণার পাশে রানার কাছাকাছি বসে আছে বাটি। হঠাৎ একটা হাত তুলে লম্বা করল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রজাপতি উড়ে এসে বসল তার আঙুলে। হলুদ আর কালো ভেলভেটের মত ডানা বারবার মেলছে আর গুটাচ্ছে। রানা আর নিমা তাকিয়ে আছে অবাক চোখে, কারণ ওদের মনে হলো বাটি মনে মনে ডাক

দেয়াতেই তার আঙুলে এসে বসেছে ওটা। খিকখিক করে হেসে উঠে হাতটা নিমার দিকে সরিয়ে আনল বাটি। দেখাদেখি নিমাও ওর হাত তুলে লম্বা করল। এবং কি আশ্চর্য, প্রজাপতিটা উড়ে চলে এল ওর আঙুলে।

খিলখিল করে হেসে উঠল নিমা। 'ধন্যবাদ, বাটি, এত সুন্দর একটা উপহার দেয়ার জন্যে,' হাসি থামতে বলল ও। হালকা একটু ফুঁ দিয়ে প্রজাপতিটাকে উড়িয়ে দিল, রানার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বলল, 'বুনো পশু-পাখিদের সঙ্গে ওর খুব ঘনিষ্ঠতা, লক্ষ করেছেন? ব্যাপারটা অদ্ভুত না?'

'সন্ন্যাসী আর পুরোহিতরা বিনা বাধায় ওকে ঘুরে বেড়াতে দেয়, পশু-পাখিরা সম্ভবত জেনে ফেলেছে ওর দ্বারা তাদের কোন ক্ষতি হবে না।'

যেন ওদের কথা বুঝতে পেরেই হেসে উঠে আবার হাতটা লম্বা করল বাটি। এবারও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রজাপতি এসে বসল তার আঙুলে।

'অদ্ভুত!' বলল নিমা। 'ছেলেটাকে সত্যি আমি ভালবাসি।'

'সিরিয়াসলি ভাবছি, কেন আমি বাটি হয়ে জন্মাইনি!' কৌতুক করল রানা।

খিলখিল করে হেসে উঠে নিমা বলল, 'বাটি হয়ে জন্মালেও আপনি খুশি হতেন না। কারণ আমি জানি আপনি আমার ছোট ভাই হতে চান না।'

আরও পঞ্চাশ ফুট ওপরে ওঠার পর ঝর্ণার উৎসটা দেখতে পেল ওরা। লাল স্যান্ডস্টোনের নিচু একটা পাঁচিল দেখা গেল, পাঁচিলের গায়ে একটা গুহামুখ, সেটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে ঝর্ণার পানি। গুহামুখে ঘন ঝোপ, ভেতরটা দেখা যায় না। হাঁটু গেড়ে ঝোপ সরাল রানা, নিচু ফাঁকের ভেতর তাকাতে চেষ্টা করল। 'তেমন কিছু দেখার নেই। ভেতরটা অন্ধকার,' বলল ও। 'তবে অনেক লম্বা গুহাটা।'

'ওটার তুলনায় আপনি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছেন,' বলল নিমা। 'আমাকে ঢুকতে দিন।'

'ভেতরে কেউটে থাকতে পারে,' সাবধান করল রানা। 'প্রচুর ব্যাঙ দেখতে পাচ্ছি।'

জুতো খুলে ঝর্ণার পানিতে নেমে পড়ল নিমা, রানার কথা যেন শুনতে পায়নি। স্রোত ঠেলে এগোতে কষ্ট হচ্ছে ওর, তবে ডুবেছে মাত্র উরুর অর্ধেকটা। গুহাটা নিচু, ভেতরে ঢোকার সময় ঝুঁকে শরীরটাকে প্রায় অর্ধেক করে নিতে হলো। ভেতরে ঢোকার পর বলল, 'সামনের দিকে আরও নিচু হয়ে এসেছে ছাদ।'

'বি কেয়ারফুল, ডিয়ার গার্ল। কোন ঝুঁকি নেবেন না।'

'আমি আপনার ডিয়ার নই। আমি গার্লও নই।'

'তাহলে ইয়াং লেডি বলি?'

'না, কেন! আমার নাম নিমা।' কিছুক্ষণ আর কোন কথা হলো না। তারপর গুহার ভেতর থেকে নিমা বলল, 'আর এগোতে পারছি না। সরু হয়ে গুহাটা একটা শ্যাফটে নেমেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'শ্যাফট?'

'মানে প্রায় চৌকো একটা গর্ত আর কি।'

'কৃত্রিম? মানুষের তৈরি?'

'বলা সম্ভব নয়। তীরবেগে পানি বেরুচ্ছে। পাথরে কোন টুলসের দাগ দেখছি না। খোঁড়াখুঁড়ির কোন চিহ্নও নেই। প্রচুর শ্যাওলা।'

'পানির তোড় না থাকলে ওই শ্যাফট গলে কোন মানুষ ঢুকতে পারবে?'

'বামুন হলে পারবে।'

'কিংবা কোন বাচ্চা ছেলে?'

'হ্যাঁ, বাচ্চা ছেলে হলে পারবে। কিন্তু ওখানে কে একটা বাচ্চাকে নামাবে?'

'টাইটার যুগে শিশুশ্রম ব্যবহার করা হত,' বলল রানা। 'টাইটাও হয়তো ব্যবহার করেছে।'

গুহা থেকে বেরিয়ে এসে পাড়ে উঠল নিমা। 'অসম্ভব নয়।'

'এদিক থেকে টানেলটা পরীক্ষা করার কোন উপায় নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'অসম্ভব,' জোর দিয়ে বলল নিমা। 'পানির বেগ ওখানে প্রবল। শ্যাফটের ভেতর হাত গলাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার শক্তিতে কুলোয়নি।'

ব্যাগ হাতড়ে কালো একটা অ্যানাডাইজড ইন্সট্রুমেন্ট বের করল রানা। 'অ্যানারয়েড ব্যারোমিটার। প্রত্যেক নেভিগেটরের কাছে একটা থাকা উচিত।' কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখে রিডিং নোট করল ও।

'খুলে বলুন।'

'আমি জানতে চাই সিঙ্ক-হোলের মুখ যে লেভেলে রয়েছে, এই ঝর্ণা তার চেয়ে নিচে কিনা। তা যদি না হয়, সম্ভাবনার তালিকা থেকে এটাকে আমরা বাদ দিতে পারি।'

'এখন তাহলে আমরা সিঙ্ক-হোলের লেভেল মাপতে যাব?'

'বলেছি না, মেয়ের বুদ্ধি আছে!'

ঠোঁট টিপে রানাকে ভেঙচাল নিমা।

ওরা কোথায় যাচ্ছে জানার পর নতুন একটা পথ দেখাল বাটি, ঝর্ণার উৎস থেকে টাইটার পুলের ওপর পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় পৌছুতে দু'ঘণ্টার বেশি লাগল না। বিশ্রাম নেয়ার সময় নিমা মন্তব্য করল, 'বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তো, গেম ট্রেইলের সবগুলো ওর চেনা। গাইড হিসেবে দারুণ।'

'উস্তাভের চেয়ে ভাল,' বলল রানা। ব্যারোমিটার বের করে আরেকটা রিডিং নিল ও।

'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুব খুশি।'

'খুশি হবার সঙ্গত কারণ আছে,' বলল রানা। 'নদীর সারফেস থেকে খাদের এই পাঁচিলের মাথা একশো আশি ফুট। সারফেস থেকে সিঙ্ক-হোল আরও পঞ্চাশ ফুট। হিসাবে বলছে, রিজের উল্টোদিকে আপনার ঝর্ণার উৎস সিঙ্ক-হোলের চেয়ে একশো ফুটেরও বেশি নিচে।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ প্রচুর সম্ভাবনা আছে স্রোতটা এক ও অভিন্ন হবার। ইনফ্লো এখানে, টাইটার পুলের তলায়; আর আউটফ্লো গুহার ভেতর।'

'কিন্তু কাজটা করল কিভাবে টাইটা?' হতভম্ব দেখাল নিমাকে। 'কিভাবে নামল পুলের তলায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এ-সব কাজ করার নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি আছে। পানির তলায় বহুকাল আগে থেকে কাজ করছে মানুষ। পানির নিচে ব্রিজের পিলার তৈরি করে না? কিংবা বাঁধের ভিত? ভেবে দেখুন না, জলের প্রবাহ মাপার জন্যে টাইটা নীলনদের লেভেলের নিচে শ্যাফট তৈরি করেনি? সে তার হাইড্রোগ্রাফ-এর বর্ণনা দিয়েছে রিভার গড-এ, মনে পড়ে? প্রতিষ্ঠিত টেকনিক হলো একটা কফার ড্যাম তৈরি করা...' হঠাৎ থেমে গেল ও। 'আরে, একটা ড্যাম! টাইটা, বুড়ো ভাম, নদীতে বাঁধ দেয়নি তো?'

'কিন্তু তা কি সম্ভব?'

'আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, টাইটার পক্ষে সবই সম্ভব। তার হাতে লোকবল ছিল প্রচুর। আসওয়ানের কাছে নীলনদে সে যদি হাইড্রোগ্রাফ তৈরি করতে পারে, তারমানে ধরে নিতে হবে হাইড্রোডাইনামিক্স প্রিন্সিপল্ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল তার। হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব!'

'আমরা প্রমাণ করব কিভাবে?'

'ডানডেরা নদীকে বাঁধা বিশাল একটা কাজ। কিছু না কিছু প্রমাণ আজও রয়ে গেছে, থাকতে বাধ্য।'

'সেই বাঁধ টাইটা কোথায় তৈরি করতে পারে?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে নিমা। 'আপনি হলে কোন জায়গাটা বেছে নিতেন?'

'একটা জায়গার কথা বলতে পারি আমি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল রানা। 'ট্রেইল যেখানে নদীর কিনারা ছেড়ে ঘুরপথে উপত্যকা ধরে নেমেছে, আর নদীটা যেখানে গহ্বরে পড়েছে।' দু'জনেই ওরা একযোগে মাথা ঘুরিয়ে উজানের দিকে তাকাল।

'তাহলে আমরা অপেক্ষা করছি কেন?' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল নিমা। 'চলুন দেখে আসি!'

উত্তেজনাটা সংক্রামক, হাসির ফোয়ারা ছেড়ে নাচতে নাচতে কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে ট্রেইল ধরল বাটি, তারপর উপত্যকা বেয়ে উঠে এল ট্রেইল যেখানে নদীর পাশে ফিরে এসেছে। আবার যখন জলপ্রপাতের ওপরে এসে দাঁড়াল ওরা, সূর্য তখন অনেকটাই নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। ডানডেরা এখানে লাফ দিয়ে পড়েছে গহ্বরের মুখে, তারপর সর্বশেষ দৌড় শুরু করেছে নীলনদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। 'টাইটা যদি এখানে বাঁধ দিয়ে থাকে-' খাদের মুখের দিকটায় হাত তুলল রানা, '-সাইড ভ্যালির দিকে নদীর দিক বদল সম্ভব।'

'আমারও মনে হচ্ছে সম্ভব!' হেসে উঠল নিমা। কিছু না বুঝে ওদের সঙ্গে বাটিও হাসছে।

হাত তুলে চোখে ছায়া ফেলল রানা, মুখ তুলে জলপ্রপাতের দু'দিকে ব্লাফ দুটোর দিকে তাকাল। ব্লাফ দুটো লাইমস্টোনের তোরণ বা গেট তৈরি করেছে, মাঝখানে গর্জন করছে নদী ঠোঁট থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ার সময়। 'ওদিকটায় উঠতে চাই আমি, এলাকার লেআউট বুঝতে হবে। আপনি উঠবেন?'

'বাধা দিয়ে দেখতে পারেন,' চ্যালেঞ্জ করল নিমা, ওঠার সময় সে-ই পথ দেখাল। কঠিন চড়াই, কোথাও কোথাও হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হলো। অনেক জায়গায় আলগা বা ঝুরঝুরে হয়ে আছে লাইমস্টোন, বিপদ ঘটার সমূহ আশঙ্কা। তোরণটার পুব শাখার চূড়ায় উঠতে ঘেমে গোসল হয়ে গেল ওরা। তবে এত কষ্টের পুরস্কারও জুটল। নিচের দুর্গম এলাকা পুরোপুরি উন্মোচিত হয়েছে ওদের সামনে।

সরাসরি উত্তরে লম্বা সরু শৈলশিরা ও মালভূমি খাড়া পাঁচিলের মত মাথাচাড়া দিয়ে আছে, যেন সচ্ছিদ্র দুর্গ-প্রাকার, অসংখ্য ভাঁজ আর খাঁজ বিশিষ্ট। আরও দূরে ও ওপর দিকে অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণী, চোক পর্বতমালার চূড়া, কাছাকাছি উজ্জ্বল নীল আফ্রিকান আকাশের গায়ে ম্লান নীল পাখির পালকের মত।

'প্রকৃতির বিধ্বস্ত রূপ,' নিজের চারপাশে তাকিয়ে ফিসফিস করল নিমা। 'টাইটা এই জায়গা কেন বেছে নিয়েছিল, বোঝা যায়। অনুপ্রবেশ এখানে প্রায় অসম্ভব।'

'ছবিটা এখন পরিষ্কার,' বলল রানা, হাত লম্বা করে নিচের উপত্যকাটা দেখাল। 'উপত্যকার বিভক্তিরেখা স্পষ্ট। জমিনের স্বাভাবিক পতনও দেখতে পাচ্ছি। ওদিকে, খাদের ওপার থেকে আমাদের নিচের পয়েন্ট পর্যন্ত সবচেয়ে সরু। সরু গলা বলতে পারি, নদী সংকুচিত হয়ে ওটা দিয়ে বেরিয়েছে-বাঁধ তৈরির জন্যে আদর্শ সাইট।' শরীরটা মুচড়ে বাম দিকটা দেখাল নিমাকে। 'নদীর পানি উপত্যকায় ছড়িয়ে দেয়া কঠিন কাজ ছিল না। গহ্বরের ভেতর নদী শুকিয়ে যাবার পর সে ওখানে কি করেছে আমরা জানি না। তারপর বাঁধের দেয়াল ভেঙে ফেলে সে, সেটা আরও সহজ কাজ ছিল। ভেঙে ফেলার পর নদী আবার তার স্বাভাবিক কোর্স ফিরে পায়।'

ওদের দু'জনের মুখভাব গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করছে বাটি, যে যখন কথা বলে তখন তার দিকে তাকায়। কিছুই বুঝছে না, তবু নিমার প্রতিটি হাবভাব ও আচরণ তার ওপর বিরাট প্রভাব ফেলছে। নিমা মাথা ঝাঁকালে সে-ও ঝাঁকায়। নিমা ভুরু কোঁচকালে সে-ও তাই করে। আর নিমা যখন হাসে, খিকখিক করে সে-ও হেসে ওঠে।

'নদীটা ছোট নয়,' বলল নিমা। 'নিশ্চয়ই মাটি দিয়ে বাঁধটা বানায়নি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'মাটি দিয়ে এই নদীকে বশ মানানো সম্ভব নয়। রক প্যাব বা পাথরের ফলক দিয়ে সম্ভব। পরে বাঁধটা ভেঙে ফেললেও কিছু কিছু আলামত থাকার কথা।'

'তাহলে খোঁজ শুরু করতে হয়,' বলল নিমা। 'প্রথমে খাদের সরু গলায়। তারপর ভাটির দিকে এগোব।'

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা, নিমার জন্যে সহজ পথ অনুসরণ করছে বাটি। নিমার হাঁটার গতি কমলে বা বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামলে হাতছানি দিচ্ছে সে। উপত্যকার গলায় বেরিয়ে এল ওরা, দাঁড়াল নদীর পাথুরে পাড়ে, নিজেদের চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। 'বাঁধের পাঁচিল কত উঁচু ছিল?' জিজ্ঞেস করল নিমা।

'খুব বেশি উঁচু হওয়ার কথা নয়।' পাঁচিলের পাশ ধরে খানিকটা ওপরে উঠল

রানা, ওখানে উবু হয়ে বসে সামনে-পিছনে মাথা ঘোরাল, প্রথমে দেখে নিল উপত্যকার নিচের দিকের দৈর্ঘ্য, তারপর দেখল গহ্বরের মুখে পতনশীল জলপ্রপাতের ঠোঁট। তিনবার স্থান বদল করল রানা, প্রতিবার ঢালের আরেকটু ওপর উঠে গেল। যত উঠল ততই খাড়া হচ্ছে ঢাল। শেষে দেখা গেল ঢালের গায়ে অনেক কষ্টে ঝুলে আছে ও, তবে চেহারা দেখে মনে হলো সন্তুষ্ট। ওখান থেকেই চিৎকার করল নিমার উদ্দেশে, 'আমার ধারণা এই পর্যন্ত উঁচু ছিল বাঁধটা। ধরুন, পনেরো ফুট।'

নিমা এখনও নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে, ওখান থেকে এবার উল্টোদিকের পাড়ে তাকাল, পাড় থেকে খাড়া উঠে যাওয়া লাইমস্টোন প্রাচীরের দূরত্ব আন্দাজ করছে। 'এখান থেকে খুব বেশি হলে একশো ফুট,' গলা চড়িয়ে বলল।

'কঠিন কাজ, তবে অসম্ভব নয়,' বলল রানা।

'কাজের কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল নিমা। 'বাঁধের পাঁচিল পাহাড়ের গায়ে ঠেকাতে হয়েছিল টাইটাকে।'

একই লেভেলে থেকে জায়গা বদল করল রানা। এক সময় সরাসরি জলপ্রপাতের ওপর চলে এল, তারপর আর সামনে এগোবার উপায় দেখছে না। নিচে, নিমা আর বাটির পাশে নেমে এসে বলল, 'প্রায় চার হাজার বছর আগের ঘটনা। কোন চিহ্ন না থাকাই স্বাভাবিক। রক ব্লক বা পাথরের ফলক পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে, বাঁধ ভেঙে ফেলার পর তীব্র স্রোতে ভেসে গেলেও কত দূর আর যাবে।'

'উপত্যকা বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। খানিক দূর নামার পর একটা পাথরের খণ্ড দেখতে পেল নিমা, আশপাশের অন্যান্য পাথরের সঙ্গে যেন বেমানান। পুরানো আমলের কেবিন ট্রাংকের মত আকার। শ্যাওলা আর লতাপাতায় অর্ধেকটাই ঢাকা, তবে বেরিয়ে থাকা অংশে ডান দিকে মোচড় খাওয়া একটা কোণ স্পষ্ট। রানাকে ডেকে দেখাল ও।

প্যাবটার গায়ে হাত বুলাল রানা। 'সম্ভব। তবে নিশ্চিত হবার জন্যে বাটালির দাগ পেতে হবে, রাজমিস্ত্রী যেখানে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেছিল। আপনি জানেন, প্রথমে পাথরের গায়ে বাটালি দিয়ে গর্ত করা হত, তারপর গজাল ঢুকিয়ে চাপ দেয়া হত, যতক্ষণ না ফেটে যায়।'

আরও আধ কিলোমিটার পর্যন্ত উপত্যকার মেঝে সার্চ করল ওরা। 'বন্যার সময়ও এত দূরে কোন ব্লক ভেসে আসবে না,' বলল রানা। 'চলুন, দেখি জলপ্রপাত হয়ে গহ্বরের মুখে কিছু পড়েছে কিনা।'

ডানডেরার পাড়ে ফিরে এল ওরা, ঢাল বেয়ে নামল জলপ্রপাত পর্যন্ত। উঁকি দিয়ে তাকাল রানা। 'ভাটির চেয়ে এদিকটায় গভীরতা কম,' বলল রানা। 'আমার ধারণা একশো ফুটও হবে না।'

'ভাবছেন আপনি ওখানে নামতে পারবেন?' নিমার চোখে সন্দেহ। নিচ থেকে বিস্ফোরিত হয়ে উঠে আসছে বাষ্পকণা ঘন মেঘের মত, চোখ-মুখ ভিজিয়ে দিচ্ছে। পানির বিরতিহীন পতন বজ্রপাতের মত আওয়াজ করছে, কথা বলার সময় চিৎকার করছে ওরা।

'রশি, আর টেনে তোলার লোক থাকলে ভেবে দেখা যেত।' কিনারায় শক্ত হয়ে বসল রানা, চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে নিচের গামলার দিকে তাকাল। আলগা পাথরের ছোটবড় অনেক স্তূপ রয়েছে ওখানে–ছোট আকৃতির গোল পাথর, কয়েকটা বেশ বড়। কিছু পাথর কোণ বিশিষ্ট, কল্পনার সাহায্য নিলে কিছু পাথরকে চৌকো বলেও মনে হবে। তবে ওগুলোর সারফেস পানির তোড়ে মসৃণ হয়ে আছে, ভেজা ও চকচকে। বেশিরভাগই আংশিক জলমগ্ন, সচল জলকণায় ঢাকা।

'ওগুলো সে পেল কোত্থেকে?' হঠাৎ জানতে চাইল নিমা।

'কে কি পেল?' রানা বিস্মিত।

'আপনি বুঝতে পারছেন না? ভুল দিক থেকে শুরু করেছি। আমরা জানার চেষ্টা করছি ব্লকগুলোর কি গতি হয়েছে। তার বদলে আমাদের খোঁজ করা উচিত নয়, ব্লকগুলো টাইটা পেল কোত্থেকে?'

'তাই তো! শেষটা জানার চেষ্টা করছি আমরা, শুরুটা নয়। বাঁধের ভাঙা পাঁচিল নয়, আমাদের খোঁজা উচিত পাথরের খনি। কোয়ারি!'

'কোত্থেকে শুরু করা যায়?' নিমার ব্যাকুল প্রশ্ন।

নিমার প্রশ্ন বুঝতে পারুক বা না পারুক, খিক খিক করে হেসে উঠল বাটি। দু'জনেই ওরা একযোগে তার দিক তাকাল। তারপর হাতছানি দিয়ে বাটিকে ডাকল নিমা। পাশে বসিয়ে আরবীতে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করে বলল তাকে। শোনার পর চোখ বড় বড় করল বাটি, তারপর উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'জেসাস স্টোন! জেসাস স্টোন! আসুন আমার সঙ্গে, আপনাদের দেখাই!' দাঁড়াল নিমা, বাটি তাকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উপত্যকার ঢাল বেয়ে।

বাটি ছুটছে, তার সঙ্গে নিমাকেও ছুটতে হচ্ছে। আনন্দে অ্যামহারিক গীত গাইছে ছেলেটা। ওদের পিছু নিয়ে আস্তে-ধীরে হাঁটছে রানা। উপত্যকার আধ মাইল নিচে মিলিত হলো ওদের সঙ্গে।

এখানে রানা বাটিকে দেখল হাঁটু গেড়ে বসে পাথুরে পাঁচিলে কপাল ঠেকিয়ে রেখেছে। প্রার্থনা করছে সে, চোখ দুটো বন্ধ। তার পাশে নিমাও বসে আছে।

খানিক পর লাফ দিয়ে সিধে হলো বাটি, ধুলো উড়িয়ে নাচল কিছুক্ষণ। 'প্রার্থনা শেষ, এবার আমরা জেসাস স্টোনের কাছে যেতে পারি।' নিমার হাত ধরল আবার, পাথরের পাঁচিল ঘেঁষে এগোল। রানার সামনে থেকে ওরা দু'জন যেন চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল, যাকে বলে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

'নিমা!' ডাকল ও। 'কোথায় আপনি? কি ব্যাপার?'

'এদিকে, রানা! এদিকে আসুন!'

সাবধানে পা ফেলে পাথরের পাঁচিলের সামনে চলে এল রানা। 'ওহ্, গড! এ তো আমি এক বছর চেষ্টা করলেও খুঁজে পেতাম না!'

পাহাড়-প্রাচীরের গা ভাঁজ খেয়ে, ভেতর দিকে ঢুকে গেছে, তৈরি করেছে গোপন একটা প্রবেশপথ। খাড়া দুই পাশ বেয়ে ওপরে উঠে গেল রানার দৃষ্টি, ফাঁকটায় ঢুকে পড়েছে। ত্রিশ কদম পেরুতে খোলা একটা অ্যামফিথিয়েটারে ঢুকল, কম করেও একশো গজ লম্বা হবে, আকাশের দিকটা উন্মুক্ত। দেয়ালগুলো

নিরেট পাথর, এক পলক তাকিয়েই রানা বুঝতে পারল উপত্যকার মেঝেতে নিমার পাওয়া পাথরটার মত স্ফটিকতুল্য শিলা বা অভ্র এগুলো।

লক্ষণ দেখে বোঝা গেল গামলা থেকে পাথর কেটে ফাঁকা করা হয়েছে জায়গাটা, সারি সারি স্তর কাটার দাগ পাঁচিলের মাথা পর্যন্ত লম্বা। কাটার পর সব ব্লক সরানো হয়নি, অ্যাম্পিথিয়েটারের মেঝেতে স্তূপ করা রয়েছে। আবিষ্কারটা হতভম্ব করে তুলেছে রানাকে, নড়তে বা কথা বলতে পারছে না। একেবারে নিখুঁত চারকোনা পাথরও পড়ে আছে মেঝেতে, প্রয়োজন না পড়ায় বের করা হয়নি। নিমাকে নিয়ে সেটার সামনে দাঁড়িয়েছে বাটি।

নিমার হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে বাটি। 'জেসাস স্টোন। জেসাস আমাকে পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে আসেন। প্রথম যেদিন এলাম, দেখি এই পাথরে ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। লম্বা সাদা দাড়ি ছিল, চোখ দুটো মায়া ভরা, দয়ালু, কিন্তু বিষণ্ণ।' গান শুরু করে বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকল সে, গানের তালে তালে দুলছে।

এগিয়ে এসে রানা দেখল পাথরটার ওপর শুকনো ফুল, মাটির পাত্র, তেজ ফ্লাস্ক ইত্যাদি পড়ে রয়েছে। তারমানে নিয়মিতই এখানে আসে বাটি, জেসাস স্টোন তার ব্যক্তিগত বেদি, যীশুকে খুশি করার জন্যে নৈবেদ্য দিয়ে যায়।

প্রাচীন বেদির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে নিমা, দেখাদেখি বাটিও। প্রার্থনা শেষ হতে রানার পাশে চলে এল নিমা, দু'জন ঘুরেফিরে দেখছে কোয়ারির মেঝেটা। এত নিচু গলায় কথা বলছে ওরা, জায়গাটা যেন পবিত্র কোন ধর্মীয় স্থান।

ঘুরেফিরে দেখার পর কোয়ারির প্রবেশমুখে থামল ওরা, ইতিমধ্যে সূর্য ডুবে গেছে, দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। একটা সাইজ করা চৌকো পাথরের ওপর বসল ওরা, বাটি বসল ওদের পায়ের কাছে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে, মুখ তুলে নিমার দিকে তাকিয়ে আছে।

'লেজ থাকলে নাড়ত,' বলে হাসল রানা। তারপর বাটির দিকে তাকাল। 'বাটি, তোমার ওপর আমরা খুব খুশি। তুমি খুব ভাল ছেলে!'

'ওর প্রশংসা পরে করলেও চলবে,' বলল নিমা। 'চলুন, ফিরে যাই।'

'ফেরাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না,' বলল রানা। 'আজ চাঁদ উঠবে না, অন্ধকারে পা ভাঙব।'

'এখানে ঘুমানোর প্ল্যান করছেন?' নিমা অবাক।

'অসুবিধে কি? বললেই আগুন জ্বালতে পারি। সঙ্গে সারভাইভাল রেশন আছে। আর আপনার সঙ্গে তো প্রহরী আছেই, কাজেই আপনার সম্ভ্রম হুমকির সম্মুখীন হবে না।'

'সত্যিই তো, অসুবিধে কি!'

আগুন জ্বালার জন্যে শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করতে যাবে রানা, হঠাৎ স্থির হয়ে কান পাতল। শব্দটা নিমাও শুনতে পাচ্ছে। 'আবার সেই প্রস্পি হেলিকপ্টার,' বলল রানা। 'এই অসময়ে কি খুঁজছে ওরা?'

অ্যামফিথিয়েটারের মাথার ওপর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, এক

হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেল 'কপ্টারটা, লাল আর সবুজ নেভিগেশন্যাল আলো মিটমিট করতে দেখা গেল। মঠের দিকে যাচ্ছে ওটা।

চার

ঘুমটা কেন ভাঙল বুঝতে পারেনি রানা। কোথায় রয়েছে মনে পড়ল, দেখল কোয়ারির ভেতর ওর কাছাকাছি শুকনো ঘাসের ওপর শুয়ে রয়েছে নিমা। আকাশে চাঁদ নেই, তবে তারাগুলো যেন মাটির কাছাকাছি নেমে এসেছে, একেকটা পাকা আঙুরের মত বড়। আগুনটা নিভে এসেছে, ওধারে শুয়ে নাক ডাকছে বাটি। ব্লাডার খালি করার জন্যে উঠতে হলো রানাকে।

আগুনটাকে পাশ কাটিয়ে ফিরে আসছে, যে শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে সেটা আবার ভেসে এল দূর থেকে। অস্পষ্ট, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে আসছে, ফলে বোঝা যায় না উৎসটা ঠিক কোন দিকে। এই আওয়াজ আগেও অনেকবার শুনেছে ও। অটোমেটিক গানফায়ারের শব্দ, সম্ভবত একে-ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল থেকে বেরুচ্ছে। বিরতিহীন নয়, প্রতিবার তিন রাউন্ড করে। প্রফেশনালের কাজ।

ভোরের দিকে নিমার ঘুম ভাঙাল রানা। অবশিষ্ট রেশন থেকে ব্রেকফাস্ট সেরে গোলাগুলির কথাটা জানাল ওকে। 'উস্তাভ হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল নিমা। 'সে হয়তো শাফি আর রুবিকে ধরে ফেলেছে।'

'মনে হয় না। উস্তাভ কয়েকদিন আগে রওনা হয়েছে, তার গুলির আওয়াজ এত দূর পৌঁছুবে না।'

'তাহলে?'

'কি জানি। আমার ভাল ঠেকছে না, নিমা। কোয়ারিটা আরেকবার দেখে ক্যাম্পে ফিরে যাই চলুন।'

আলো জোরাল হতে কোয়ারির কয়েকটা ছবি তুলল রানা। কয়েকটা ব্লকের ছবি তোলার সময় ওগুলোর পাশে পোজ দিল নিমা, মেরিলিন মনরোর ভঙ্গিতে একটা হাত মাথার পিছনে রেখে।

উপত্যকার ঢাল বেয়ে ফেরার পথে সন্তুষ্ট দেখাল ওদেরকে, প্রাচীন কোয়ারি আবিষ্কার ওদের অভিযানকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। এরপর কিভাবে কি করা হবে, সে-আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়ল ওরা। গহ্বরের নিচের অংশ ফেকাসে লাল পাহাড়-প্রাচীরের কাছে যখন পৌঁছুল, বেলা তখন প্রায় এগারোটা। মঠ থেকে ট্রেইল ধরে উঠে আসা একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হলো ওখানে।

ওদেরকে দূর থেকে দেখেই বোঝা গেল, অত্যন্ত খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। করুণ রসে সিক্ত সন্ন্যাসীদের উলুধ্বনি শুনে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। শোক প্রকাশের জন্যে এই ধ্বনি দেয়া আফ্রিকান ঐতিহ্যর অংশ। ওরা দেখল

সন্ন্যাসীরা মুঠো মুঠো ধুলো নিয়ে নিজেদের মাথায় ঢালছেন।

নিমার নির্দেশে ব্যাপার কি জানার জন্যে সন্ন্যাসীদের দিকে ছুটল বাটি। বাটিকে দেখে কেঁদে ফেলল সন্ন্যাসীরা, চিৎকার করে দুঃখজনক কোন ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে। একটু পরই ছুটে ফিরে এল বাটি। 'আপনাদের ক্যাম্পে লোকজন নেই। একদল শয়তান এসেছিল। চাকরবাকরদের অনেকেই নেই–খুন হয়ে গেছে।'

খপ করে নিমার কব্জি চেপে ধরল রানা। 'আসুন!' ছুটল ও, 'দেখি কি হয়েছে!'

শেষ এক মাইল ছুটে ক্যাম্পে পৌঁছুল ওরা, কিচেন শেডের সামনে কিছু একটাকে ঘিরে আরও একদল সন্ন্যাসীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। ভিড় ঠেলে সামনে চলে এল রানা, পেটে শূন্য একটা অনুভূতি, আতংকে মুখের ঘাম ঠাণ্ডা লাগছে। ঝাঁকে ঝাঁকে ভন ভন করছে নীল মাছি, মাঝখানে পড়ে আছে রক্তে ভাসমান কুক সহ আরও তিনজন ক্যাম্প সার্ভেন্টের লাশ। প্রথমে তাদের হাতগুলো পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে, হাঁটু গাড়তে বাধ্য করা হয়েছে মাটিতে, তারপর খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে মাথার পিছনে।

নিমাকে এগিয়ে আসতে দেখে বাধা দিল রানা, 'তাকাবেন না!'

ওর কথায় কান না দিয়ে পাশে এসে দাঁড়াল নিমা। 'ওহ্, গড!' দু'হাতে মুখ ঢাকল।

এগিয়ে এসে লাশগুলো দেখল রানা। 'খালিদ, মোস্তফা আর জহিরকে দেখছি না। কোথায় ওরা? জহির, কোথায় তুমি?'

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল জহির। 'এখানে, স্যার!' গলাটা কেঁপে গেল তার, মুখ ঝুলে পড়েছে। তার শার্টের সামনে শুকনো রক্ত দেখা গেল।

'কি হয়েছে বলো!' জহিরকে ধরে সিধে করল রানা।

'ওরা ছিল শুফতা, ডাকাত, খুনী! ওরা ছিল হায়েনা, শিয়াল, সাপ! রাতের অন্ধকারে হঠাৎ আসে, এসেই গুলি ছোঁড়ে কুঁড়ে লক্ষ্য করে। কতজন ছিল বলতে পারব না, কেন এভাবে খুন করল তাও বলতে পারব না!' ফোঁপাতে লাগল জহির।

খানিক পর জানা গেল নিমার ঘর তছনছ করা হয়েছে। ক্যানভাস ফোল্ডারের প্রচুর ফটোগ্রাফ আর কাগজ-পত্র ছিল, খালি করে নিয়ে গেছে সব। ওদের হেডকোয়ার্টারও তছনছ করা হয়েছে। স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ আর ম্যাপ, পাথর ফলকের রাবিং, পোলারয়েড–কিছুই নেই।

নিজের কুঁড়ে থেকে ছুটে নিমার কুঁড়েতে চলে এল রানা। 'একই অবস্থা আমার ঘরেরও। সমস্ত কাগজ-পত্র নিয়ে গেছে, রাইফেলটাও। পাসপোর্ট আর ট্র্যাভেলার্স চেক ডে-প্যাকে ছিল বলে রক্ষা পেয়েছে!'

নিঃশব্দে কাঁদছে নিমা। 'আমাদের গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে গেছে ওরা, এমনকি পোলারয়েডগুলোও বাদ দেয়নি। ওহ্, রানা, মিশরে আমাদের মরুভূমির বাসাতে যা ঘটেছিল, এখানে আবার ঠিক তাই ঘটল। ওদের হাত থেকে এখানেও আমরা নিরাপদ নই। কাল রাতে আমরা ক্যাম্পে থাকলে কি ঘটত?' ছুটে

এসে রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'ওই রোদের মধ্যে আমরাও মরে পড়ে থাকতাম!'

ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতদের সঙ্গে কথা হয়েছে রানার। ওঁদের ধারণা, আক্রমণটা ওকে আর নিমাকে খুন করার জন্যেই করা হয়। বলছেন, এখান থেকে এখুনি ওদের চলে যাওয়া উচিত, কারণ আবার হামলা হতে পারে।

খালিদ, মোস্তফা আর জহিরকে রওনা হবার প্রস্তুতি নিতে বলেছে রানা। খবর দিয়ে আশপাশের গ্রাম থেকে মসজিদের ইমাম সাহেব আর কয়েকজন মুসলমান গোত্রপ্রধানকে আনানো হবে, তারাই জানাজা পড়ে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করবেন লাশগুলোর। ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতরা কথা দিয়েছেন, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কর্তৃপক্ষকে ঘটনার কথা জানাবেন তাঁরা।

একঘণ্টার মধ্যে রওনা হবার জন্যে তৈরি হয়ে গেল ওরা। সমস্ত ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট আর উস্তাভের ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র প্রধান পুরোহিত ওলি জারকাসের দায়িত্বে রেখে যাওয়া হচ্ছে। খচ্চরগুলোর পিঠে হালকা বোঝা চাপানো হলো।

প্রধান পুরোহিত এসকর্ট হিসেবে একদল সন্ন্যাসীকে পাঠালেন, ওদেরকে পাহাড় চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। স্কিনিং শেডে ডোরাকাটা ডিক-ডিকের ছাল আর খুলিটা পেল রানা, গুটিয়ে একটা বান্ডিল বানাল, স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে দিল একটা খচ্চরের বোঝার ওপর।

এসকর্ট পার্টির সঙ্গে বাটিও রয়েছে। সারাক্ষণ নিমার কাছাকাছি থাকল সে। ট্রেইল ধরে রওনা হলো ওরা, প্রথম এক মাইল ওদের সঙ্গে আসছেন সন্ন্যাসীদের বড় একটা মিছিল।

দুপুর পার হয়ে গেল টাইটার ড্যাম সাইটে পৌঁছুতে। নদীর পানিতে মাথা ধোয়ার জন্যে কয়েক মিনিট এখানে থামল ওরা। জলপ্রপাতের ওপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকল, দু'জনের মনই বিষণ্ণ ও কাতর হয়ে আছে। 'কবে নাগাদ আবার ফিরব আমরা?' ফিসফিস করে জানতে চাইল নিমা।

'বর্ষা শুরু হতে আর দেরি নেই,' বলল রানা। 'হায়েনারাও গন্ধ পেয়ে কাছে চলে আসছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, নিমা।'

গহ্বরের ভেতর তাকিয়ে বিড়বিড় করল নিমা, 'এখনও তুমি জেতোনি, টাইটা। খেলায় আবার আমরা ফিরে আসব।'

সন্ধে হয়ে এলেও নদীর পাশে স্থায়ী ক্যাম্পসাইটে থামল না ওরা, অন্ধকারে পথ চলা অসম্ভব না হওয়া পর্যন্ত কয়েক মাইল এগোল। তাঁবু ফেলে আরাম করার কথা ভাবল না কেউ, সন্ন্যাসীদের দেয়া রুটি আর ছাগলের দুধ খেয়ে পাথুরে জমিনের ওপর বেডরোল খুলে শুয়ে পড়ল। ক্লান্ত শরীর, সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে গেল।

পরদিন ভোরে সূর্য ওঠার আগে খচ্চরের পিঠে মাল-পত্র তোলা হলো, কড়া কফি খেয়ে ট্রেইল ধরল ওরা। সদ্য ওঠা সূর্য এসকার্পমেন্টের খাড়া পাঁচিল আলোকিত করে তোলায় এত কাছে মনে হলো যেন ছোঁয়া যাবে। নিমার পাশে চলে এসে রানা বলল, 'এভাবে হাঁটলে আশা করা যায় বিকেলের দিকে এসকার্পমেন্টের

গোড়ায় পৌঁছে যাব। জলপ্রপাতের-পিছনের গুহায় রাত কাটানো সম্ভব হতে পারে।'

'তারমানে কাল কোন এক সময় ট্রাকের কাছে পৌঁছুব,' বলল নিমা। 'রানা, অনেকক্ষণ ধরে একটা কথা ভাবছি আমি। ধরুন, আমাদের পোলারয়েড আর রাবিংগুলো প্রক্সির কারও হাতে পড়েছে, যে ওগুলোর অর্থ করতে পারবে। আমরা কতদূর এগিয়েছি এটা বোঝার পর তার প্রতিক্রিয়া কি হবে?'

'ও-সব কথা পরে ভাবা যাবে, নিমা,' জবাব দিল রানা। 'সঙ্গে রিগবি রাইফেলটা পর্যন্ত নেই, কাজেই খুব অসহায় বোধ করছি। আগে প্রাণে বাঁচি, তারপর অন্য কিছু।'

খালিদ, খচ্চরচালক আর সন্ন্যাসীরাও তাই ভাবছে, কারণ দেখা গেল তাদের হাঁটার গতি মুহূর্তের জন্যেও মন্থর হচ্ছে না। দুপুরের দিকে অল্প সময়ের জন্যে থামার নির্দেশ দিল রানা, নিজেরা কফি খাবে, খচ্চরগুলোকে পানি খাওয়াবে। খালিদ আগুন জ্বালছে, বিনকিউলার নিয়ে পাথুরে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল রানা। খুব বেশি দূর ওঠেনি, ঘাড় ফেরাতে দেখতে পেল পিছু নিয়ে উঠে আসছে নিমাও। কাছে এসে বলল, 'দেখতে এলাম কি করছেন আপনি।'

'সামান্য রেকি। সামনে স্কাউট রাখা দরকার ছিল, এভাবে অন্ধের মত ট্রেইল ধরে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। যত দূর মনে পড়ে, ঠিক সামনেই পড়বে অত্যন্ত কঠিন পথ। আল্লাই জানে কিসের মধ্যে গিয়ে পড়ব।'

আরও ওপরে উঠল ওরা, তবে চূড়ায় ওঠা সম্ভব হলো না বিশাল এক পাহাড়-প্রাচীর পথরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকায়। বাধাটার ঠিক নিচে ভাল একটা জায়গা বেছে নিয়ে উপত্যকার দুটো ঢালই বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে পরীক্ষা করল রানা। এই এলাকার কথা মনে আছে ওর। এসকার্পমেন্ট ওয়াল-এর গোড়ায় পৌঁছুতে যাচ্ছে ওরা, জমিন এদিকে অসম্ভব এবড়োখেবড়ো আর রুক্ষ-কঠিন, খোলা সমুদ্রের-ঢেউয়ের মত, অনুভবে ডাঙার অস্তিত্ব টের পেয়ে তীরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার আগে সাজ সাজ রব তুলে ফুলে-ফেঁপে ওঠা। ট্রেইল খুব কাছ থেকে অনুসরণ করেছে নদীটাকে। নদীর পাড় বলতে সরু আল, তার ওপর ঝুলে আছে পাহাড়-প্রাচীর—রোদ-বৃষ্টি-ঝড়-বরফ নির্যাতনের স্টীমরোলার চালিয়ে অদ্ভুত, ভীতিকর আকৃতি দিয়েছে, ডিজনির কার্টুনে দেখা দুষ্ট ডাইনীর সচ্ছিদ্র দুর্গ যেন। এক জায়গায় ট্রেইলের ওপর ঝুলে আছে লাল স্যান্ডস্টোনের বিশাল এক পাথুরে অবলম্বন, বাধ্য হয়ে ওটাকে ঘুরে এগোতে হয়েছে নদীকে, ওখানে ট্রেইল এত সরু হয়ে গেছে যে বোঝা সহ একটা খচ্চর যেতে চাইলে পাড় থেকে নদীতে পড়ে যাবার ভয় আছে।

চোখে লেন্স লাগিয়ে উপত্যকার তলাটা সাবধানে দেখে নিল রানা। বেমানান বা সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পেল না, কাজেই মাথা তুলে নিজেদের ওপর দিকে পাহাড়-প্রাচীরে দৃষ্টি বুলাল।

এই সময় নিচের উপত্যকা থেকে খালিদের চিৎকার ভেসে এল। 'জলদি, স্যার! খচ্চরগুলো রওনা হবার জন্যে রেডি হয়েছে।'

হাত ঝাঁকিয়ে তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলল রানা, তারপর আবার

বিনকিউলার তুলে সামনের জমিনের ওপর দৃষ্টি বুলাল। ঝিক করে চোখে লাগল উজ্জ্বল একটা আলো। ভুরু কুঁচকে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে সমস্ত মনোযোগ এক করল রানা।

'কি ব্যাপার?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল নিমা। 'কি দেখলেন?'

'নিশ্চিত নই। বোধহয় কিছু না,' চোখ থেকে বিনকিউলার না নামিয়ে জবাব দিল রানা। পালিশ করা কোন ধাতব বস্তুর সারফেসে, অন্য একজোড়া বিনকিউলারের লেন্সে, কিংবা একটা রাইফেলের ব্যারেলে রোদ লেগে থাকতে পারে।

'জলদি, স্যার! খচ্চরচালকরা অপেক্ষা করতে রাজি নয়!' আবার খালিদের চিৎকার ভেসে এল।

দাঁড়াল রানা। 'কিছু না, চলুন।' নিমার হাত ধরে নামতে সাহায্য করছে রানা। হঠাৎ ঢালের ওপর দিক থেকে ভেসে পাথর নড়াচড়ার আওয়াজ। নিমাকে ছেড়ে দিয়ে ঠোঁটে আঙুল রাখল ও। অপেক্ষা করছে ওরা, স্কাইলাইনের ওপর চোখ।

অকস্মাৎ বাঁকা একজোড়া শিং মাথাচাড়া দিল চূড়ার কিনারায়, ওগুলোর নিচে বুড়ো এক পুরুষ হরিণের মাথা। আড়ষ্ট হয়ে আছে কান দুটো, নিঃশ্বাস ফেলছে ঘন ঘন। পাহাড়-প্রাচীরের কিনারায় থামল ওটা, ঠিক ওরা যেখানে গুড়ি মেরে বসে আছে তার সরাসরি ওপরে, যদিও ওদেরকে দেখতে পায়নি এখনও। হরিণটা ঘাড় ফেরাল, ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে আছে। এদিকের চোখটা রোদ লাগায় ঝিক করে উঠল। দাঁড়ানোর সতর্ক ভঙ্গি, আড়ষ্ট কান আর পিছন ফিরে তাকানোই বলে দেয় কোন কারণে ভয় পেয়েছে।

তারপর হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল হরিণটার শরীরে। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল রিজের পিছনে, দূরে মিলিয়ে গেল ছুটে পালানোর শব্দ।

'কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে ওটা,' ঢালের নিচে তাকিয়ে বলল রানা। খচ্চর আর সন্ন্যাসীদের কাফেলা এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছে, নদীর উঁচু পাড়ের ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে।

'আমাদের এখন তাহলে কি করা উচিত?' জানতে চাইল নিমা।

'সামনের পথ রেকি করা দরকার, কিন্তু সেজন্যে যে সময় দরকার তা নেই।' কাফেলা দ্রুত এগোচ্ছে, এখুনি ঢাল বেয়ে নিচে না নামলে পিছনে পড়ে থাকবে ওরা। বিপদের নিরেট কোন প্রমাণ এখনও পায়নি রানা, সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করাও চলে না। 'আসুন!' নিমার হাত ধরল ও, ছুটে নেমে আসছে ঢাল বেয়ে।

কাফেলার পিছনে চলে এল ওরা, রানা এখনও ওদের মাথার ওপর স্কাইলাইন গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করছে। পাহাড়-প্রাচীর কাত হয়ে ঝুলে আছে ওদের ওপর, ঢেকে ফেলেছে অর্ধেক আকাশ। ওদের বাম দিকে নদী নিজের শব্দ দিয়ে অন্য সব শব্দ মুছে ফেলছে।

পাহাড়-প্রাচীরের মাথা থেকে একটা পাতা ঝরে পড়তে দেখছে রানা। গরম বাতাসে শুকনো পাতাটা ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে আসছে। এত ছোট, কোন বিপদসংকেত হতে পারে না, তবু অলস কৌতূহলবশত ওটার পতন লক্ষ্য করছে

ও। বাদামী পাতাটা অবশেষে ওর মুখ স্পর্শ করল। হাত তুলে ধরল রানা, দু'আঙুলের মাঝখানে নিয়ে ঘষা দিল, জানে গুঁড়িয়ে যাবে।

কিন্তু মসৃণ আর নরম লাগল জিনিসটা। হাত খুলল রানা, ভাল করে দেখল। পাতা নয়, ছেঁড়া এক টুকরো গ্রিজড পেপার। মাথার ভেতর সতর্ক-সংকেত বেজে উঠল। সেমটেক্স আর প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের যুগে সামরিক কাজে ব্লাস্টিং জেলিগনাইট আজকাল খুব কমই ব্যবহার করা হয়, তবে মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি আর মিনারেল এক্সপ্লোরেশনে এখনও জিনিসটার চাহিদা ব্যাপক। সাধারণত নাইট্রোজেলাটিন স্টিক বাদামী রঙের গ্রিজড পেপারে মোড়া থাকে, স্টিকের মাথায় ডিটোনেটর সেট করার আগে এক্সপ্লোসিভ এক্সপোজ করার সময় কাগজে মোড়কটার একটা প্রান্ত ছিঁড়ে ফেলা হয়।

রানার মাথার ভেতর ঝড় বইছে। ওরা এইপথে আসবে এটা জানার পর কেউ যদি পাহাড়-প্রাচীরে জেলিগনাইট বসিয়ে থাকে, তাহলে আলোর যে প্রতিফলন দেখা গেছে সেটা বিস্ফোরকগুলোর মাঝখানে পড়ে থাকা কপার ওয়্যায়ারিং-এর কয়েল থেকে সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে অপারেটর লোকটা এই মুহূর্তে পিছনের পাহাড়ে কোথাও শুয়ে আছে। বুড়ো হরিণ সম্ভবত তাকে লুকিয়ে থাকতে দেখে ভয় পেয়েছিল।

'খালিদ!' রানার গলার শিরা ফুলে উঠল। 'থামাও ওদের! ফিরিয়ে আনো!' কাফেলার মাথায় পৌঁছুনোর জন্যে ছুটল ও, মন বলছে এরইমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওদের পিছনে পাহাড়ে সত্যি যদি কেউ থাকে, রানার প্রতিটি নড়াচড়া পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। কাফেলার মাথায় পৌঁছে খচ্চরগুলোকে সরু ট্রেইলে ঘোরানো, তারপর নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে আনা, সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ছোটার গতি কমিয়ে আনল রানা, তবে এখনও চিৎকার করে ফিরে আসতে বলছে ওদেরকে, সেই সঙ্গে হাতছানি দিয়ে ডাকছে নিমাকে।

ছুটে আসছে নিমা, ধৈর্য হারিয়ে রানাও খানিকটা পিছিয়ে এল। 'কি ব্যাপার, রানা?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল নিমা।

'ট্র্যাক থেকে সরে যেতে হবে। পরে ব্যাখ্যা করব।' নিমার হাত ধরে ফেলে আসা পথ ধরে ছুটল রানা, আবার খালিদের নাম ধরে ডাকল।

পঞ্চাশ গজও কভার করতে পারেনি, পাহাড়-প্রাচীরের মুখ বিস্ফোরিত হলো। বাতাসের তীব্র আলোড়ন ধাক্কা মারল, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার অবস্থা হলো ওদের। কান ও মাথার ভেতর ব্যথা করে উঠল। তারপর বিস্ফোরণের মূল শক্তি ঝাঁকি দিয়ে গেল ওদেরকে—একটামাত্র বিস্ফোরণ নয়, একের পর এক অনেকগুলো, যেন মাথার ওপর বিরতিহীন বজ্রপাত হচ্ছে। দিশেহারা হয়ে উঠল ওরা, পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। নিমাকে আঁকড়ে ধরে পিছন দিকে তাকাল রানা, দেখল পাহাড়-প্রাচীরের চূড়ায় পর পর কয়েকটা বিস্ফোরণ ঘটল। লম্বা, নৃত্যরত পাথর আর ধুলোর ঝর্ণা একের পর এক উথলে উঠছে।

আতংকে দিশেহারা, তবু জেলিগনাইট সাজানোর দক্ষতা লক্ষ্য করে রানার মনে সমীহ জাগল। এ একজন মাস্টার বম্বারের কাজ। পাথরখণ্ডের ধস এক সময় থামল, এখন শুধু স্বচ্ছ নীল আকাশের গায়ে মিহি ধুলো দেখা যাচ্ছে। মুহূর্তের

জন্যে মনে হলো ধ্বংসযজ্ঞের সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু তারপরই পাহাড়-প্রাচীরের কাঠামো বদলে যেতে শুরু করল।

প্রথমে ধীরে ধীরে পাথরের পাঁচিল বাইরের দিকে কাত হলো। পাহাড়ের গায়ে বিশাল ফাটল সৃষ্টি হতে দেখল রানা, যেন রাক্ষসের প্রকাণ্ড মুখ খুলে যাচ্ছে। পাথরের বিরাট পাত ধসে পড়ছে, স্লো মোশনে নেমে আসছে ওদের ওপর। ভেঙে পড়ার আওয়াজ শুনে মনে হলো একই সঙ্গে হুংকার ছাড়ছে আর গোঙাচ্ছে শত শত টন পাথর, গোটা পাহাড়-প্রাচীর অনেক নিচের নদীতে পড়ে যাচ্ছে।

দৃশ্যটা সম্মোহিত করে ফেলেছে রানাকে, মনে হলো বিস্ফোরণের ফলে ব্রেন অবশ হয়ে গেছে। চিন্তা শক্তি ফিরে পেতে কিংবা তৎপর হতে সময় লাগল, নিজের ওপর জোর খাটাতে হলো। ও দেখল, বেশিরভাগ বিস্ফোরণ ঘটেছে ট্রেইলের সামনের দিকে, কাফেলার মাথার কাছে। ওদিকে বাটি ছিল, খালিদের পাশে। এক্সপ্লোসিভ ট্র্যাপের ভেতরে ওরা দু'জনও ঢুকবে, এই আশায় পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় অপেক্ষা করছিল বম্বার। কিন্তু নিমাকে নিয়ে রানা যখন উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করল, বিস্ফোরণ ঘটাতে বাধ্য হয়েছে সে।

অসহায় দাঁড়িয়ে থেকে পতনশীল পাথরের বিশাল স্রোতটাকে নেমে আসতে দেখছে রানা ওর সামনে ট্রেইলের ওপর, গ্রাস করছে লোকজন আর খচ্চরগুলোকে, কিনারা থেকে বিরতিহীন জলপ্রপাতের মত লাফ দিয়ে পড়ছে নদীর তলায়। পাথর ধসের কান ফাটানো গর্জনের ভেতর থেকেও লোকজনের আর্তনাদ ভেসে আসছে।

ধ্বংসযজ্ঞ ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ, এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ব্যাখ্যা করার সময় নেই, যে-কোন মুহূর্তে টন টন পাথরের নিচে ওরাও চাপা পড়ে যাবে। ঝট করে নিমাকে দু'হাতে ধরে বুকে তুলে নিল রানা, লাফ দিয়ে পাড় টপকে নদীর দিকে পড়ল। পাড়ের ঢালে দু'জন একসঙ্গে পড়ল ওরা, বারবার গড়িয়ে নেমে এল ত্রিশ ফুট। এখানে বড় একটা পাথর পড়ে আছে, আকারে একটা বাড়ির মত হবে। ওই পাথরে লেগে স্থির হলো শরীর দুটো।

ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা, নিমার হাত ধরে দাঁড় করাল, তারপর ওকে নিয়ে চলে এল পাথরটার উল্টোদিকে। এদিকে, জমিন ঘেঁষে, ভেতর দিকে একটা ভাঁজ খেয়েছে পাথর, সেই ভাঁজের ভেতর ঢুকে পড়ল ওরা।

যতটা সম্ভব পিছিয়ে এসে পাথুরে খোলের ভেতর শুয়ে থাকল দু'জন। ধ্বংসযজ্ঞ আরও বিস্তৃত হয়েছে, এতক্ষণে ওদের ওপর নামতে শুরু করল ধসটা। বিশাল রাবার বলের মত লাফ দিতে দিতে প্রকাণ্ড টুকরোগুলো ছুটে আসছে, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে গতি, তারপর ওদের শেলটারের সামনের দিকটায় লেগে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। গড়িয়ে এসে একটা করে টুকরো ভাঙে, অমনি প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে কাঁপতে শুরু করে ওদের শেলটার। ধাক্কা খেয়ে বিস্ফোরিত পাথরের ছোট টুকরোগুলো মিসাইলে পরিণত হলো, বাতাসে শিস কেটে নদীতে গিয়ে পড়ছে। নদীতে বড় বড় ঢেউ জাগল, আছড়ে পড়ে ভাঙার সময় দুই তীরে ফেনা জমে উঠল।

ওদের শেলটারের ওপর ইতিমধ্যে কয়েকশো টন পাথর ধসে পড়েছে, তবে

এ সবে মাত্র শুরু। এক সময় মনে হলো পাহাড়ের অর্ধেকটাই নেমে আসছে ওদের ওপর। ধুলো এখন ঘন মেঘের মত, দু'হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, খকখক করে কাশছে দু'জনেই। বিশাল বাড়ির মত শেলটার পাথর ধসে চাপা পড়ে যাচ্ছে, বুঝতে পেরে নিমার ওপর উঠে এল রানা, নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে ফেলল ওকে। ছোট্ট একটা পাথর টোকা দিল ওর মাথার পাশে, তাতেই চোখে অন্ধকার দেখল রানা। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করল ও, অনুভব করল কানের পিছন গরম একটা স্রোত, জ্যান্ত প্রাণীর মত চিবুকে নেমে আসছে ওটা।

তারপর ধীরে ধীরে মাটি ও পাথর ধস বন্ধ হলো। এখন আর ওদের শেলটার ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে না। মিহি ধুলো হালকা হয়ে যাচ্ছে। নিস্তেজ হয়ে পড়ছে পাথরের গর্জন।

সাবধানে চোখের পাতা থেকে ধুলো পরিষ্কার করল রানা। ওর নিচে নড়ে উঠল নিমা। হামাগুড়ি দিয়ে সরে এল রানা, নিমা যাতে বসতে পারে। বসার পর দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকল। সাদা ধুলো মুখোশ পরিয়ে রেখেছে ওদেরকে। মাথার চুলকে মনে হচ্ছে উইগ। 'আপনার মুখে রক্ত,' আতংকে কর্কশ শোনাল নিমার গলা।

'খুলির চামড়া সামান্য একটু কেটে গেছে,' বলল রানা। 'আপনার খবর কি?'

'আমার হাঁটু মচকেছে। সিরিয়াস বলে মনে হয় না, অল্প অল্প ব্যথা করছে।'

'তাহলে বলতে হবে অদ্ভুত ভাগ্য আমাদের,' বলল রানা। 'এই ঘটনায় কারুরই বাঁচার কথা ছিল না।'

নিমা হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরুতে যাচ্ছে দেখে হাত ধরে বাধা দিল রানা। 'না! গোটা ঢাল আলগা হয়ে আছে। পুরোপুরি স্থির হতে আরও সময় লাগবে। তাছাড়া...'

'তাছাড়া কি?'

'ওদেরকে জানতে দেয়া চলবে না আমরা বেঁচে আছি,' বলল রানা। 'জানলেই শেষ করার জন্যে ছুটে আসবে।'

রানার কথা শেষ হওয়া মাত্র 'কপ্টার এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল, কাছাকাছি কোথাও থেকে টেক-অফ করছে। নিমাকে ধরে আবার শুইয়ে দিল রানা, নিজেও ওর পাশে শুয়ে পড়ল।

মাথার ওপর এসে চক্কর দিচ্ছে 'কপ্টারটা। বোধহয় জীবিত কাউকে খুঁজছে, ভাবল রানা। রোটরের আওয়াজ দূরে সরে যাচ্ছে, পাথরের ভাঁজ থেকে মাথা বের করে বাইরে উঁকি দিল রানা। আধ মাইল উজানের দিকে যান্ত্রিক ফড়িংটাকে দেখা গেল, প্রক্সির জেট রেঞ্জারই বটে। দূরে সরে যাচ্ছে, ফলে উইন্ডস্ক্রীনের ভেতর ককপিটটা পরিষ্কার দেখা গেল না। তবে ঠিক সেই সময় 'কপ্টারের গতি কমে এল, দিক বদলে উত্তর দিকে যাচ্ছে এখন, এবার প্যাসেঞ্জারদের দেখার একটু সুযোগ পাওয়া গেল। পাইলটের পাশেই বসে রয়েছে জ্যাক রাফেল, আর কর্নেল জুলিয়াস ঘুমা বসেছেন ঠিক ওদের পিছনে। সবাই ওরা তাকিয়ে আছে নিচের নদী ও উপত্যকায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রিজের আড়ালে হারিয়ে গেল 'কপ্টারটা।

'আর কোন সন্দেহ নেই,' বলল রানা। 'প্রক্সির মালিক যে-ই হোক, আপনার চাচাকে খুন করা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত খারাপ যা কিছু ঘটেছে তার জন্যে সে-ই দায়ী। রাফেল আর কর্নেল ঘুমা তাঁর বেতনভুক চাকর মাত্র।'

'কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব?' নিমা মানতে পারছে না। 'কর্নেল ঘুমা ইথিওপিয়ান আর্মির একজন অফিসার!'

'এটা আফ্রিকা, নিমা, সম্ভাব্য সব কিছু বিক্রি হয়,' বলল রানা। 'শুনুন, এ-সব নিয়ে পরে চিন্তা-ভাবনা করা যাবে। এখন আমাদের প্রথম কাজ এই খাদ থেকে বেরিয়ে সভ্য জগতে ফিরে যাওয়া।' হামাগুড়ি দিয়ে পাথরের ভাঁজ থেকে বাইরে বেরিয়ে এল ও, ধীরে ধীরে দাঁড়াল।

ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে গেল রানার দৃষ্টি। ওদের ওপরে ট্রেইলটা পাথরধসে চাপা পড়ে গেছে। ওর পাশে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতে চেষ্টা করল নিমা, গুঙিয়ে উঠে পড়ে যাবার উপক্রম করল, রানা ধরে না ফেললে যেতও পড়ে। 'হাঁটু!' শরীরের ভর ভাল অর্থাৎ ডান পায়ে চাপাল নিমা, সাহস করে হাসল। 'ঠিক হয়ে যাবে।'

'ট্রেইল ধরে যাওয়া সম্ভব নয়,' বলে নিমাকে নিয়ে নদীতে নেমে এল রানা, নামার সময় আবার পাথর ধস শুরু হয় কিনা ভেবে ভয়ে ভয়ে থাকল।

কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে রানার খুলির ক্ষতটা ধুয়ে দিল নিমা, রানার ডে-প্যাক হাতড়ে অ্যান্টিসেপটিক মলমের একটা টিউব বের করল। মলম লাগাবার পর রানার গলা থেকে ব্যানড্যানা খুলে ব্যান্ডেজও বেঁধে দিল। 'প্রথম কাজ বাটিকে খুঁজে বের করা,' রানাকে মনে করিয়ে দিল।

নদীর পাড় ঘেঁষে পানি কেটে এগোল ওরা। নদীর তলা আলগা পাথরে ভর্তি, খুব সাবধানে এগোতে হচ্ছে। প্যাকটা পানির ওপর তুলে রেখেছে রানা। আলগা পাথরের ভেতর দিয়ে ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠা অত্যন্ত কঠিন মনে হলো। খানিক দূর ওঠার পরই দু'জন সন্ন্যাসীর থেতলানো লাশ দেখতে পেল ওরা, পাথরের নিচে অর্ধেক চাপা পড়ে আছে। একটা খচ্চরের শুধু একটা পা বেরিয়ে আছে বাইরে। পিঠের বোঝা খুলে গেছে, জিনিস-পত্র ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। দেখতে পেয়ে, ডিক-ডিকের গুটানো ছালটা তুলে নিল রানা, আটকে রাখল ওর ব্যাগের সঙ্গে।

শেষবার যেখানে বাটি আর খালিদকে দেখা গেছে সেদিকে উঠছে ওরা। কিন্তু এক ঘণ্টা সার্চ করার পরও দু'জনের একজনকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। ওদের ওপর ঢালটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে, ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে ঝোপ আর গাছপালা। হাঁটুর জখম নিয়ে যতটা সম্ভব ওপরে উঠল নিমা, হাত দিয়ে মুখের সামনে চোঙ তৈরি করে ডাকছে, 'বাটি! বাটি! বাটি!' ওর চিৎকার উপত্যকার পাঁচিলে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসছে।

রানা বলতে চাইল, ডেকে কোন লাভ নেই, সে বেঁচে থাকলে তো! কিন্তু বলল না।

ব্যথায় মুখ বিকৃত হয়ে আছে নিমার, তবু হাল ছাড়তে রাজি নয়। 'বাটি! সাড়া দাও, ভাই! বাটি, কোথায় তুমি?'

নিমা কেঁদে ফেলবে, এই ভয়ে ওর দিকে তাকাচ্ছে না রানা।

আর ঠিক তখন আরও ওপরের ঢাল থেকে অস্পষ্ট একটা কাতর শব্দ ভেসে

এল। গুড়িয়ে উঠে ঢাল আঁচড়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে নিমা। বাধা না দিয়ে পিছু নি
রানা। খানিক দূর উঠেই কেঁদে ফেলল নিমা। প্যাক ফেলে ওর পাশে চলে এ
রানা। ইতিমধ্যে ঢালের ওপর হাঁটু গেড়েছে নিমা।

পাথর ধসের নিচে চাপা পড়েছে বাটির শরীর। ছেঁড়া-ফাড়া মুখটা প্রায় চেনা
যায় না, চামড়ার অর্ধেকটাই নেই। মাথাটা কোলে তুলে নিল নিমা, শার্টের আস্তি
দিয়ে নাকের ফুটো থেকে ধুলো বের করছে, আরও যাতে ভাল ভাবে শ্বাস নিতে
পারে। বাটির মুখের কোণ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে—আবার যখন কাতর আওয়াজ
করল, গলগল করে বেরিয়ে এল। সেটা মুছতে গিয়ে সারা মুখে লেপ্টে দিল নিমা।

বাটির শরীরের নিচের অংশ পাথরে চাপা পড়েছে। পাথরে সরাতে চেষ্
করল রানা, তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করল কাজটা সম্ভব নয়। বড় একট
খণ্ডের নিচে রয়েছে বাটি, আকারে সেটা বিলিয়ার্ড বোর্ডের দ্বিগুণ হবে। কত ট
ওজন হবে পাথরটার আন্দাজ করা কঠিন, বিশ থেকে পঁচিশ টনের কম হবে না
সন্দেহ নেই, শিরদাঁড়া আর পেলভিস চুরমার হয়ে গেছে। সাহায্য ছাড়া একজনে
পক্ষে এই পাথর সরানোর প্রশ্নই ওঠে না। সম্ভব যদি হতও, পাথরটার নড়াচড়
চিড়ে-চ্যাপ্টা শরীরটাকে আরও শুধু কষ্টই দিত।

অদ্ভুত এক অভিমান নিয়ে রানার দিকে তাকাল নিমা। 'কিছু একটা করুন
প্লীজ, কিছু একটা করুন!'

চোখ ভিজে এলেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখল রানা। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল ও
ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল নিমা, চোখের জল বৃষ্টির ফোঁটার মত পড়ছে বাটি
কপালে।

'ও এভাবে মারা যাবে আর আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব?' রানার দিকে
করুণ চোখে তাকাল নিমা। এই সময় চোখ মেলে ওর দিকে তাকাল বাটি।

ছাল ছাড়ানো রক্ত ভেজা মুখ, অথচ হাসছে বাটি। কুৎসিত বীভৎস চেহারা
ওই হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'আম্মি!' ফিসফিস করল সে। 'আপনি আমার
মা। মা ছাড়া এত আদর কে করে! আম্মি, তোমাকে আমি ভালবাসি!'

কথাগুলো আড়ষ্ট, শেষ হতেই শরীরে একটা খিঁচুনি উঠল। ব্যথায় বিকৃত
হয়ে গেল চেহারা, ককিয়ে উঠল একবার, তারপর স্থির হয়ে গেল। আড়ষ্ট ভাবটুকু
দূর হলো কাঁধ থেকে, মাথাটা কাত হয়ে গেল একদিকে।

কাঁদছে নিমা, মাথাটা কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। তারপর
ওর কাঁধ ছুঁয়ে রানা বলল, 'ও মারা গেছে, নিমা।'

মাথা ঝাঁকাল নিমা। 'জানি। শুধু আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে বেঁচে ছিল
ও।'

বাটির মাথাটা নিমার কোল থেকে তুলল রানা, সরে এসে ধীরে ধীরে দাঁড়াল
নিমা। বাটির মাথা নামিয়ে রেখে তার হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে দিল
রানা। তারপর আলগা পাথর দিয়ে ঢেকে দিল লাশটা। 'এবার আমাদের যেতে
হয়, বাটি।'

বাটির কবরে একটা চুমো খেলো নিমা। তারপর রানার কাঁধে ভর দিয়ে নেমে
এল নদীতে।

পানি কেটে উজানের দিকে রওনা হলো ওরা। পাথর ধস নদীর অর্ধেকটাই ভরাট করে ফেলেছে, ফলে অবশিষ্ট ফাঁক গলে পানি খুব দ্রুত ছুটে চলেছে। দুর্গত এলাকা ছাড়িয়ে এসে নদীর পাড়ে উঠল ওরা, তারপর খাড়া ঢাল বেয়ে পৌঁছুল ট্রেইলে। এখানে সামান্য বিশ্রাম নিল, তাকাল পিছন দিকে। পাথর ধসের নিচে লালচে-খয়েরি দেখাচ্ছে নদীর পানি। মঠের সন্ন্যাসীরা বিস্ফোরণের আওয়াজ যদি না-ও শুনে থাকে, ঘোলা পানি দেখে চিন্তায় পড়ে যাবে, কি ঘটেছে দেখার জন্যে এদিকে আসবে। লাশগুলো তুলে নিয়ে যাবে মর্যাদার সঙ্গে কবর দেয়ার জন্যে। চিন্তাটা খানিকটা হলেও সান্ত্বনা এনে দিল রানার মনে। নিমাকে নিয়ে আবার রওনা হলো ও। এই ট্রেইল ধরে দু'দিনের কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে ওদেরকে।

নিমা এখন খুব বেশি খোঁড়াচ্ছে। কিন্তু রানা সাহায্য করতে গেলে ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিল ওর হাত। 'কিছু না, শুধু একটু আড়ষ্ট লাগছে।' হাঁটুটা পরীক্ষা করতেও দিল না, জেদ করে রানার সামনে থাকল।

রাতটা ওরা এসকার্পমেন্টের নিচে কাটাল। সামনেই খাড়া পাঁচিল বেয়ে উঠে গেছে পথটা। পথ থেকে নিমাকে বেশ খানিকটা সরিয়ে আনল রানা, থামল গাছপালায় ঢাকা একটা নালায়। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর আগুন জ্বালল, জানে বাইরে থেকে দেখা যাবে না। এবার হাঁটুটা রানাকে দেখতে দিল নিমা। চামড়া ওঠা জায়গাটা ফুলে আছে, ছুঁতে খুব গরমও লাগল। মাথা নাড়ল রানা। 'এই পা নিয়ে আপনার হাঁটা ঠিক হচ্ছে না।'

'আর কোন উপায় আছে?' জিজ্ঞেস করল নিমা। জবাব না দিয়ে বোতলের পানি দিয়ে নিজের ব্যানড্যানাটা ভেজাল ও, তারপর শক্ত করে বেঁধে দিল পায়ে। দুটো পেইনকিলার ট্যাবলেট খেতে দিল।

সারভাইভাল রেশন সামান্যই অবশিষ্ট আছে, আধপেটা খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো। আগুনের ধারে বসে ফিসফাস করছে দু'জন। 'চূড়ায় ওঠার পর কি ঘটবে?' জানতে চাইল নিমা। 'যেখানে রেখে এসেছি সেখানে কি ট্রাকগুলো পাব? পাহারাদাররা আছে, নাকি কেটে পড়েছে? আর যদি প্রক্সির লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? তাহলে কি হবে?'

'আপনার কোন প্রশ্নের উত্তরই আমার জানা নেই,' স্বীকার করল রানা।

'আদ্দিস আবাবায় পৌঁছে এই ম্যাসাকারের ঘটনা পুলিসকে আমি জানাব,' বলল নিমা। 'আমি চাই জ্যাক রাফেল আর তার লোকজন উপযুক্ত শাস্তি পাক।'

'সেটা বোধহয় উচিত হবে না,' বলল রানা। 'কারণ আবার আমরা ইথিওপিয়ায় ফিরে আসতে চাই। এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি হৈ-চৈ করলে গোটা উপত্যকায় ট্রুপস আর পুলিস গিজগিজ করবে। টাইটার ধাঁধার সমাধান পাবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মামোসের সমাধির কথাও ভুলে যেতে হবে।'

'ও, হ্যাঁ, এদিকটা আমি ভাবিনি।'

'তাছাড়া, অভিযোগ করে লাভ হবে কিনা ভেবে দেখুন। কর্নেল ঘুমা রাফেলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। প্রক্সি যদি একজন আর্মি কর্নেলকে পকেটে ভরতে পারে, পুলিস অফিসারদের পকেটে ভরা তো আরও সহজ। ওদের হাত কতটা লম্বা কে জানে। হয়তো দেখা যাবে আর্মি চীফকে কিনে রেখেছে। কিংবা

কেবিনেট মেম্বারদেরও।'

'এ-ও আমি ভাবিনি,' স্বীকার করল নিমা।

'শায়েস্তা করার আরও উপায় আছে, নিমা,' বলল রানা। 'অন্যায় দেখেও সহ্য করব, আমাকে আপনি সেরকম লোক ভাববেন না।'

'আপনি একা ওদেরকে কিভাবে শায়েস্তা করবেন?'

'সেটা এখুনি আমি বলতে পারছি না।' হঠাৎ হাসল রানা। 'তবে শুধু শায়েস্তা নয়, মধুর প্রতিশোধের কথাও ভাবছি আমি।'

'মধুর প্রতিশোধ? মানে?'

'ওদের নাকের ডগা থেকে ফারাও মামোসের সমস্ত গুপ্তধন সরিয়ে নেব আমরা।'

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙার পর বসতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল নিমা। ব্যান্ডানা খুলে হাঁটুটা আবার দেখল রানা। ফোলাটা আরও বেড়েছে, আকারে প্রায় দ্বিগুণ দেখাচ্ছে হাঁটু। আবার ওটা বাঁধল ও, শেষ দুটো ট্যাবলেট খাইয়ে দিল। রানাকে ধরে দাঁড়াতে পারল নিমা, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসকার্পমেন্টের নিচে এসে দাঁড়াল। পাহাড়-প্রাচীর বেয়ে উঠে যাওয়া পথটার দিকে দু'জনই ওরা তাকিয়ে থাকল। আসার পথে কি রকম কষ্ট হয়েছে মনে পড়ে যাচ্ছে। চূড়া থেকে নিচে নামতে পুরো একটা দিন লেগেছিল ওদের।

শুরু হলো ওঠা। প্রতি পদক্ষেপের পর আরও যেন খাড়া হয়ে উঠছে পথটা। নিমা কোন আওয়াজ করছে না, তবে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আছে চেহারা, দরদর করে ঘামছে। দুপুর হয়ে গেল, এখনও ওরা জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছুতে পারেনি। তবু বিশ্রাম নেয়ার জন্যে নিমাকে থামতে বলল রানা। খাবার কিছু নেই, বোতল থেকে ঢক ঢক করে শুধু পানি খেলো নিমা। রানাও খেলো, মাত্র এক ঢোক।

কিন্তু রওনা হবার সময় দাঁড়াতে গিয়ে পারল না নিমা। 'সেরেছে!' অসহায়ভাবে তাকাল রানার দিকে। 'দাঁড়াব কি, পা তো নাড়তেই পারছি না!'

'কিছু আসে যায় না,' হেসে উঠে বলল রানা। বাম-ব্যাগ থেকে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিস ছাড়া সব বের করে ফেলল ও, তারপর সেটা কোমরে জড়িয়ে নিল। 'লাফ দিন, উঠে পড়ুন ঘোড়ার পিঠে।'

রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল নিমা। 'কি বলছেন!' তারপর চোখ তুলে ট্রেইলের দিকে তাকাল, খাড়া একটা মইয়ের মত উঠে গেছে। মাথা নাড়ল ও। 'অসম্ভব!'

'এই স্টেশন থেকে এটাই একমাত্র ট্রেন ছাড়ছে,' বলে নিমার সামনে পিছন ফিরে বসল রানা। খানিক ইতস্তত করার পর ক্রল করে ওর পিঠে উঠে পড়ল নিমা।

কিছু দূর উঠতেই হাঁপিয়ে গেল রানা, রসালাপ থেমে গেছে। ঘামে ওর শার্ট ভিজে গেল, সেই ঘাম নিমার শার্ট ভিজিয়ে দিয়ে চামড়ায় পৌঁছে গেল। উষ্ণ ভেজা ভেজা ভাবটুকু অন্য সময় হলে হয়তো অশ্লীল লাগত, এখন লাগল না। পুরুষ-পুরুষ গন্ধটাও খারাপ লাগছে না ওর, বরং আরাম আর স্বস্তিদায়ক বলে

মনে হচ্ছে।

প্রতি আধ ঘণ্টা পরপর নিমাকে নামিয়ে বিশ্রাম নিল রানা, চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকল যতক্ষণ না আবার নিয়মিত হয় শ্বাস-প্রশ্বাস। বিশ্রাম বলতে ওইটুকু, দম ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার পিঠে বোঝা তুলে নিয়ে খাড়া ট্রেইল ধরে ওঠা। এভাবে সারাটা দিন পেরিয়ে গেল। তারপর একটা বাঁক ঘুরতেই ট্রেইলের সামনে ঝুলে থাকতে দেখা গেল জলপ্রপাতটাকে, লেস লাগানো পর্দার মত। হোঁচট খেতে খেতে বিপুল জলরাশির পিছনে চলে এল রানা, গুহার ভেতর ঢুকে নিমাকে মেঝেতে নামাল। কাত হয়ে ঢলে পড়ল একপাশে, লাশের মত স্থির হয়ে গেল।

আবার যখন চোখ মেলল রানা ততক্ষণে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসীদের রেখে যাওয়া স্তূপ থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করেছে নিমা, ছোট একটা আগুন ধরিয়েছে। রানা উঠে বসতে যাচ্ছে দেখে ঝুঁকল ও, রানার মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে বলল, 'ওহ্ রানা, আজ আপনি আমার জন্যে যা করলেন, আমি এর প্রতিদান দেব কিভাবে?'

কৌতুক করে কিছু বলতে গিয়েও বলল না রানা, আসলে শক্তিতে কুলাল না। নিমার আলিঙ্গনের ভেতর চুপচাপ শুয়ে থাকল, ভয় লাগছে এই আরামটুকুর মেয়াদ হঠাৎ না শেষ হয়ে যায়। নিমা ওর মুখে আর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। 'বোকা নাকি!' হঠাৎ বলে উঠল রানা, নিমার চোখ থেকে গরম দু'ফোঁটা পানি পড়েছে ওর গালে। 'এর মধ্যে কাঁদার কি হলো?'

ধীরে ধীরে রানার মাথাটা নামিয়ে দিল নিমা, একটু সরে বসল। 'গৃহকর্তাকে স্যামন বা শ্যাম্পেন দিয়ে খুশি করতে পারছি না,' বলল ও। 'নির্ভেজাল ও পুষ্টিকর পাহাড়ী জল পেলে চলবে কি?' ভেজা চোখে হাসল ও। 'মেয়েরা কেন কাঁদে, পুরুষরা তা কোনদিনই বুঝতে পারে না, কাজেই সে প্রসঙ্গ থাক।'

'শুধু পানি খেয়ে রাত কাটাব?' মাথা নাড়ল রানা। বাম-ব্যাগ থেকে টর্চ বের করল, গুহার মেঝে থেকে খুঁজে নিল মুঠো আকৃতির একটা পাথর। টর্চের আলো ওপর দিকে তাক করতেই অসংখ্য পায়রার ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ উঠল। কার্নিসে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে ওগুলো। লক্ষ্যস্থির করে পাথরটা ছুঁড়ল রানা। এক ঢিলে তিন-চারটে পায়রা জখম হলো, তাড়াতাড়ি ছুরি বের করে সব ক'টাকে জবাই করল ও। নিমার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'রোস্ট খেতে কেমন লাগবে গৃহকর্ত্রীর?'

পায়রাগুলোকে আগুনে সেদ্ধ করার সময় নিমা জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের চুরি যাওয়া কাগজ-পত্র যে প্রক্সির হাতে পড়েছে তাতে এখন আর কোন সন্দেহ নেই, তাই না?'

'নেই,' বলল রানা। 'জলপ্রপাতের ওপর ওদের বেস ক্যাম্পে অ্যান্টেনা দেখেছি, মনে আছে? আমাদের ফটো আর কাগজ-পত্র টেলিফ্যাক্স করে রাফেল তার বসের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।'

'তারমানে প্রক্সির মালিক ট্যানাস-এর সমাধিতে পাওয়া ফলক সম্পর্কে সবই জানে এখন। আর সপ্তম স্ক্রোল তো আগেই পেয়েছে। লোকটা যদি নিজে

ঈজিপ্টোলজিস্ট না-ও হয়, তেমন একজনকে ভাড়া করতে পারে।'

'আমার ধারণা লোকটা হায়ারোগ্লিফিক্স নিজেই পড়তে পারে। আমার আরও ধারণা, লোকটা নিশ্চয়ই একজন কালেক্টর হবে। এদের টাইপ আমার জানা আছে। অবসেশনে ভোগে, ম্যানিয়াক হয়ে ওঠে।'

'চাচার তালিকায় এই টাইপের লোক ছিল দু'জন। ফ্রেড ম্যাকমোহন আর হেস ডুগার্ড।'

'দু'জনই হোমিসাইডাল কালেক্টর,' বলল রানা। 'ফারাও মামোসের ট্রেজার পাবার চেষ্টায় মানুষ খুন করতে ওদের বাধবে না।'

নিমা বলল, 'কিন্তু আমি ওদের সম্পর্কে যত দূর জানি, দু'জনেই বিলিওনেয়ার।'

'টাকার সঙ্গে খুব একটা সম্পর্ক নেই,' বলল রানা। 'এই গুপ্তধন ওরা কেউ পেলে ছোট্ট একটা আইটেমও কখনও বিক্রি করবে না। উল্টে লুকিয়ে রাখবে, দেখতে দেবে না কাউকে। একা একা উপভোগ করবে ব্যাপারটা।'

'এই কালেক্টরদের কেন যেন পাগল মনে হয় আমার,' মন্তব্য করল নিমা।

'পাগলের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক,' বলল রানা। 'আমরা বিশাল ধনী একটা ম্যানিয়াকের পাল্লায় পড়েছি।'

পাঁচ

পায়রার মাংস দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারল ওরা। তারপর কিছু না বলে গুহার পিছন দিকে চলে গেল নিমা, দেখেও না দেখার ভান করল রানা। খানিক পর নিমা ফিরে আসতে কিছু না বলে রানাও গেল, নিমা ভান করল লক্ষ্য করছে না। আরও খানিক পর পালা করে কাপড়চোপড় খুলে জলপ্রপাতের পানিতে গোসল করে এল দু'জন।

গুহাটা থেকে বেরুবার আগে পরস্পরের ক্ষত পরীক্ষা করল ওরা। রানার খুলির জখম দ্রুত সেরে উঠছে, কিন্তু নিমার হাঁটুর অবস্থা কালকের মতই খারাপ। ব্যানড্যানাটা আবার বেঁধে দেয়া ছাড়া করার মত কিছু নেই রানার।

বাম-ব্যাগ আর ডিক-ডিকের ছাল এখানে ফেলে রেখে যেতে হচ্ছে রানাকে। শরীরের সঞ্চিত শক্তি খরচ হতে শুরু করেছে, অতিরিক্ত এক পাউন্ড বোঝাও কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে; চূড়ায় পৌঁছুনোর আগে ট্রেইলের ওপরই ঢলে পড়তে পারে শরীর। ডে-প্যাকে ক্যামেরা সহ তিন রোল ডেভলপ না করা ফিল্ম ছিল, প্রতিটি প্লাস্টিক ক্যাপসুলে ভরা। ডে-প্যাকে ছিল বলেই প্রক্সির খুনীদের হাতে পড়েনি ওগুলো। ট্যানাস সমাধির ফলকে পাওয়া হায়ারোগ্লিফিক্স-এর একমাত্র রেকর্ড এগুলো, হারাবার ঝুঁকি রানা নিতে পারে না। কাজেই খাকি শার্টের বুক-পকেটে ভরে বোতাম লাগিয়ে দিল। ব্যাগ আর ছাল গুহার পিছন দিকের একটা ফাটলে

গুঁজে রাখল, পরে সুযোগ মত নিয়ে যাবে।

প্রস্তুতি নেয়ার পর শুরু হলো ওদের সবচেয়ে কঠিন যাত্রা। ট্রেইলের এই শেষ অংশটুকু অসম্ভব দুর্গম। প্রথম দিকে রানার কাঁধে হাত রেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল নিমা। কিন্তু মাত্র এক ঘণ্টা পরই পরাজয় স্বীকার করল, বলল, 'আর পারছি না।'

'কে বলেছে পারতে হবে?' নিমার সামনে পিছন ফিরে বসে পড়ল রানা।

আবার রওনা হবার পর দেখা গেল বিশ্রাম নেয়ার জন্যে ঘন ঘন থামছে রানা। ট্রেইল যেখানে ভাল, রানার পিঠ থেকে নেমে এক পায়ে হাঁটল নিমা, রানা এক হাতে জড়িয়ে ধরে রাখল ওকে। তারপর এক সময় ঢলে পড়ল নিমা, ওকে আবার নিজের পিঠে তুলে নিতে হলো রানার।

যাত্রাটা দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠছে। দু'জনেই সময়ের হিসাব ভুলে গেল। অসহ্য যন্ত্রণার ভেতর ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে। এক সময় দেখা গেল ট্রেইলের ওপর পাশাপাশি পড়ে আছে ওরা, অসুস্থ, বমি করছে, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর, ব্যথায় গোঙাচ্ছে।

'রানা, আপনি যান···আমাকে রেখে আপনি উঠে যান।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল রানা। 'পাগল নাকি!' চোখ রাঙাল ও।

'চূড়া আর বেশি দূরে নয়,' জিদ ধরল নিমা। 'উস্তাভের লোকজনকে ডেকে আনবেন, ওরা আমাকে তুলে নিয়ে যাবে।'

'ওরা ওখানে না-ও থাকতে পারে। প্রক্সির লোকজন আপনাকে পেয়ে যেতে পারে।' টলতে টলতে সিধে হলো রানা। 'উঠুন!' ধমক দিল ও। হাত ধরে সাহায্য করল দাঁড়াতে।

রানা পা ফেলছে, নিমা গুনছে। রানারই নির্দেশ। একশো পর্যন্ত গোনা শেষ হলেই থেমে বিশ্রাম নিচ্ছে ও। দম ফিরে পেলেই আবার শুরু করছে যাত্রা। রানার গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে রেখেছে নিমা, গুনছে ওর কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে। গোটা বিশ্ব যেন কুঁকড়ে ওদের সামনে সরু ট্রেইলে পরিণত হয়েছে। ট্রেইলের একপাশে যে পাহাড়-প্রাচীর মাথাচাড়া দিয়েছে বা অন্য পাশে রয়েছে গভীর খাদ, সে-সম্পর্কে দু'জনের কেউই সচেতন নয়। রানা হোঁচট খেলে বা ঝাঁকি দিয়ে পিঠের বোঝাটা অ্যাডজাস্ট করলে হাঁটুর ব্যথা ইলেকট্রিক শকের মত নিমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। দাঁতে দাঁত পিষে সহ্য করছে ও, রানাকে বুঝতে দিতে চায় না, চোখ বুজে গুনছে।

এরপর বিশ্রাম নেয়ার সময় পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকে রানা, জানে শুয়ে পড়লে আর উঠে বসতে পারবে না। তারপর বিশ্রাম নেয়ার সময় নিমাকে পিঠ থেকে নামাল না। কারণ আবার পিঠে তোলা বড় বেশি কষ্টকর।

'প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে,' রানার কানে ফিসফিস করল নিমা। 'আজ রাতের মত এখানেই থামুন। আপনি নিজেকে খুন করে ফেলছেন।'

'আর একশো কদম,' অস্ফুটে বলল রানা।

'না, রানা। নামিয়ে দিন আমাকে!'

জবাবে পাথুরে পাঁচিল থেকে কাঁধ সরিয়ে টলমল করতে করতে সিধে হলো

রানা, ট্রেইল বেয়ে ওপরে উঠছে। 'কাউন্ট!' নির্দেশ দিল।

'ফিফটি-ওয়ান, ফিফটি-টু,' নির্দেশ পালন করল নিমা। হঠাৎ করে পায়ের তলায় বিরাট একটা পরিবর্তন ঘটল, ফলে পড়ে যাবার অবস্থা হলো রানার। মাতালের মত বিক্ষিপ্ত পা ধাপে তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু আর কোন ধাপ ওখানে নেই, পথটা অকস্মাৎ সমান হয়ে গেছে।

কোন রকমে ভারসাম্য রক্ষা করল রানা। খাদের কিনারায় টলমল করছে শরীরটা, গোধূলির আবছা অন্ধকার সামনে, কি দেখছে ভাল করে বুঝতে পারছে না। অন্ধকারে আলো আছে, তবে ধারণা করল চোখে ভুল দেখছে ও। তারপর কানে এল লোকজনের আওয়াজ। মাথাটা ঝাঁকাল রানা, বাস্তবে ফিরে আসতে চাইছে।

'ওহ, ডিয়ার গড! রানা, ওহ্ রানা! আপনি পেরেছেন! আমরা চূড়ায়! ওই তো আমাদের ভেহিকেল! আপনি জিতেছেন, রানা! ইউ ডিড ইট, ম্যান। ইউ আর সো সুইট।'

কথা বলতে চাইছে রানা, কিন্তু গলা শুকিয়ে যাওয়ায় কোন শব্দ বেরুচ্ছে না। আলোটার দিকে এগোচ্ছে ও, ওর পিঠ থেকে চিৎকার জুড়ে দিল নিমা। 'এদিক আসুন, প্লীজ! প্লীজ, আমাদেরকে সাহায্য করুন!' প্রথমে ইংরেজিতে, তারপর আরবীতে। 'প্লীজ, সাহায্য করুন!'

আঁতকে ওঠার আওয়াজ হলো, তারপরই শোনা গেল লোকজনের ছুটোছুটির শব্দ। ধীরে ধীরে নিচু হলো রানা, নরম ঘাসে নিমাকে শুইয়ে দিল। গাঢ় ছায়ামূর্তিরা ঘিরে ধরল ওদেরকে। তারপর টর্চের আলো পড়ল রানার মুখে, বিশুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বলে উঠল পুরানো বন্ধু ব্যারি গরডন। 'হ্যালো, রানা? নাইস সারপ্রাইজ। আদ্দিস থেকে আমি তোমার লাশের খোঁজে এসেছি। শুনলাম তুমি নাকি মারা গেছ, হাহ্?'

'হ্যালো, ব্যারি! এত কষ্ট করার জন্যে ধন্যবাদ, দোস্ত।'

দুটো ক্যাম্প চেয়ার আনতে বলল গরডন, যত্ন করে তাতে বসানো হলো রানা আর নিমাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে দু'জনের হাতে ধরিয়ে দেয়া হলো ধূমায়িত কফির মগ। খানিক পর রানা বলল, 'কোত্থেকে কি শুনেছ বলো আমাকে, ব্যারি। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

'প্রথম খবর পাই সুদান সীমান্তের কাছে নদী থেকে তোমার গাইড ভ্লাদিমির উস্তাভের লাশ পাওয়া গেছে, বুলেটে ঝাঁঝরা।'

নিমার দিকে তাকাল রানা, ভুরু কুঁচকে সাবধান করে দিল। 'তার সম্পর্কে শেষ খবর জানি আমরা, একা একটা স্কাউটিং এক্সপিডিশনে বেরুল। চার রাত আগে আমাদের ক্যাম্প হামলা করে শুফতারা, সে-ও হয়তো তাদের সামনে পড়ে যায়।'

'হ্যাঁ, তোমাদের ওপর হামলার খবরও পেয়েছি আমরা। কর্নেল ঘুমা রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছিলেন আদ্দিসে।'

লোকজনের ভিড়ে কর্নেল ঘুমা রয়েছেন, ভিড় ঠেলে এগিয়ে না আসা পর্যন্ত তাঁকে ওরা দেখতে পেল না। ক্যাম্প লণ্ঠনের আলোয় এসে দাঁড়ালেন তিনি, তাঁর

দিকে চোখ পড়তে শিউরে উঠে আড়ষ্ট হয়ে গেল নিমা। ও কিছু বলে ফেলবে, এই ভয়ে ওর হাতটা ধরে জোরে চাপ দিল রানা।

'আপনাকে দেখে বড়ই আনন্দ বোধ করছি, মি. রানা,' কর্নেল ঘুমা সাদা দাঁত বের করে অমায়িক হাসলেন। 'আমাদের সবাইকে আপনি ভয়ানক দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলেন!'

'সেজন্যে ক্ষমা চাই,' বিনয়ের অবতার সাজল রানাও।

'প্লীজ, স্যার,' বললেন কর্নেল, 'ভুল বুঝবেন না। প্রক্সি এক্সপ্লোরেশন-এর তরফ থেকে আমরা একটা রিপোর্ট পাই, তাতে বলা হয়েছে একটা ব্লাস্টিং অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে পড়ে যান আপনারা। এক্সপ্লোরেশন কোম্পানীর জ্যাক রাফেল যখন আপনাদেরকে সাবধান করে বলেন যে খাদের ভেতর তারা পাথর ধসাচ্ছে, আমি তখন ওখানে উপস্থিত ছিলাম।'

'কিন্তু আপনি...' রেগে গিয়ে ফোঁস করে ফণা তুলল নিমা, তবে রানা আবার ওর হাতে জোরে চাপ দিতে থেমে গেল।

'আপনি যেমন বলছেন, যা কিছু ঘটেছে তার জন্যে আমাদের অবহেলাই সম্ভবত দায়ী,' বলল রানা। 'তবে আমাদের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি যা হবার ক্যাম্প স্টাফ আর সন্ন্যাসীদের হয়েছে। ওরা বেশ কয়েকজন আমাদের সঙ্গে ছিল, সবাই মারা গেছে। আদ্দিসে পৌঁছে কর্তৃপক্ষের কাছে ফুল স্টেটমেন্ট দেব আমি।'

'আশা করি আপনি কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনছেন না?'

'কারও বিরুদ্ধেই আমাদের কোন অভিযোগ নেই, কর্নেল ঘুমা,' বলল রানা। 'আপনার বিরুদ্ধে তো নয়ই। খাদের ভেতর শুফতারা আছে, এ-কথা বলে আপনি আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া, আপনি যেখানে উপস্থিত ছিলেন না, এ-সব ঠেকাতেন কিভাবে?'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. রানা।' কর্নেলকে সন্তুষ্ট দেখাল। 'এবার বলুন, স্যার, আপনাদের জন্যে কি করতে পারি আমি?'

ওরে শালা, মনে মনে গাল দিল রানা। তারপর জোর করে হাসল ও। 'দেখুন আপনি আমার এই উপকারটা করতে পারেন কিনা। ডানডেরা জলপ্রপাতের নিচের গুহায় আমি আমার ব্যাগ আর হান্টিং ট্রফি ফেলে এসেছি। ব্যাগটায় আমাদের পাসপোর্ট আর ট্যাভেলার্স চেক আছে। একজন লোককে পাঠিয়ে ওগুলো আনিয়ে দিতে পারলে সত্যি কৃতজ্ঞ বোধ করব।' হবু আততায়ীকে দিয়ে এত নগণ্য একটা কাজ করাচ্ছে ভেবে হাসি পেল রানার।

কর্নেল ঘুমা আপাতত সরে গেলেন। গরডনকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'এখানে তুমি পৌঁছুলে কিভাবে?'

'হালকা প্লেন নিয়ে ডেবরা মারিয়ামে আসি। ওখানে একটা ইমার্জেন্সী ল্যান্ডিং ফিল্ড আছে। কর্নেল ঘুমা দেখা করেন, আর্মি জীপে চড়িয়ে এখানে নিয়ে আসেন আমাদেরকে। পাইলট আর প্লেন ডেবরা মারিয়ামে অপেক্ষা করছে।'

ক্যাম্পের একজন সার্জেন্ট এসে খবর দিল, রানা আর নিমার গোসলের জন্যে

গরম পানি দেয়া হয়েছে।

পরদিন সকালে ডেবরা মারিয়াম থেকে প্লেনে চড়ে আদ্দিস আবাবায় ফিরছে ওরা। পাইলটের সঙ্গে সামনে বসেছে গরডন, নিমাকে নিয়ে রানা পিছনে। কাল রাতে নিভৃতে আলাপ করার সুযোগ হয়নি, প্লেনে বসে সেটা সেরে নিচ্ছে ওরা দু'জন। ডিক-ডিকের ছালটা রয়েছে রানার সীটের নিচে। কাল রাতেই একজন লোককে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কর্নেল ঘুমা, আজ সকালে ব্যাগ আর ছাল ফিরে পেয়েছে ও।

কাল রাতে গরডনের মুখ থেকে ওরা শুনেছে, ওদের নিখোঁজ সংবাদ ইংল্যান্ডে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা তৎপর হয়ে ওঠেন, ওপরমহলে ধরাধরি করে হোয়াইট হলে পৌঁছান তাঁরা, কথা বলেন পররাষ্ট্র ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। মাসুদ রানা ইংল্যান্ডেরও নাগরিক, আর যেহেতু ইথিওপিয়ায় বাংলাদেশের কোন কূটনৈতিক প্রতিনিধি নেই, তাই ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করা হয় তারা যেন প্রকৃত অবস্থা জানতে চেষ্টা করেন। হোয়াইট হলে আরও একজন পৌঁছান, তিনি হলেন নিমার মা। তিনিও তাঁর মেয়ের খোঁজ বের করার জন্যে চাপ দেন।

হোয়াইট হল থেকে সেই থেকে একের পর এক ফ্যাক্স আসছে। এখন যখন ওদের খোঁজ পাওয়া গেছে, ইথিওপিয়ার পুলিস কমিশনার বলেছেন তিনি নিজে রানা ও নিমার সঙ্গে কথা বলবেন। প্লেনে বসে ওরা দু'জন সিদ্ধান্ত নিল, উস্তাভের মৃত্যুর সঙ্গে অ্যালান শাফিকে কোনভাবেই জড়ানো চলবে না। আরও সিদ্ধান্ত হলো, প্রক্সিকে তো বটেই, ইথিওপিয়ান কর্তৃপক্ষকেও কোনভাবে সতর্ক করা হবে না। ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রক্সি, এটা ওরা জানে বলে স্বীকার করলে প্রতিপক্ষ ভয়ংকর কোন পদক্ষেপ নিতে পারে। আর ইথিওপিয়া কর্তৃপক্ষ যদি বুঝতে পারে মামোসের গুপ্তধন পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, ওদের ভিসা বাতিল হয়ে যাবে, এমনকি ওদেরকে ইথিওপিয়ায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করাও হতে পারে। অজ্ঞতার ভান করে নিরীহ ভাল মানুষ সাজাই সব দিক থেকে ভাল।

রানা আর নিমার ব্যাপারে লন্ডন এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যে, ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডর ওদেরকে নিজের বাড়িতে অতিথি হবার আমন্ত্রণ জানালেন গরডনের মাধ্যমে। তিনতলায় পাশাপাশি দুটো বেডরুম ছেড়ে দেয়া হলো ওদেরকে। উর্দি পরা বাটলার দু'জনকে দুই প্রস্থ কাপড়চোপড় দিয়ে গেল। পাশের কামরার সংলগ্ন বাথরুম থেকে নিমার শাওয়ার সারার আওয়াজ শুনল রানা নিজের বাথটাবে আধ শোয়া অবস্থায়। খানিক পর বেডরুম থেকে ডাক্তারের গলা ভেসে এল, নিমার হাঁটু প্রসঙ্গে কথা বলছেন।

ডিনারের খানিক আগে জানা গেল, সভ্য জগতে ওদের ফিরে আসা উপলক্ষে অ্যামব্যাসাডর রীতিমত একটা পার্টির আয়োজন করেছেন, অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে দাওয়াত দেয়া হয়েছে ইথিওপিয়ার পুলিস কমিশনার জেনারেল উর্মিদ মানামাকেও।

অ্যামব্যাসাডর নিজে রানা ও নিমার সঙ্গে জেনারেলের পরিচয় করিয়ে

দিলেন। উর্মিদ মানামা দীর্ঘদেহী মানুষ, ব্লু মেস ইউনিফর্ম তাঁকে মানিয়েছেও খুব। হ্যান্ডশেক করার সময়, নিমার হাতের ওপর কপালটা প্রায় ঠেকিয়ে ফেললেন ভদ্রলোক। খুবই রসিক আর হাসিখুশি মানুষ তিনি। রানার কাঁধ চাপড়ে প্রশংসা করলেন, 'আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, স্যার! এ কি বিশ্বাস করার মত ঘটনা, কাঁধে আহত বান্ধবীকে নিয়ে এসকার্পমেন্ট বেয়ে উঠে আসা! আই কংগ্রাচুলেট ইউ, স্যার!' তারপর তিনি মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বললেন, 'কাল আপনাদের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। স্রেফ একটা রুটিন ইন্টারভিউ, আপনাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাই।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল রানা। 'কখন যেতে বলেন, জেনারেল?'

'সকাল এগারোটার দিকে আমার ড্রাইভার এসে নিয়ে যাবে।'

ডিনার শেষ হবার পর যে যার নিজের কামরায় ফিরে এল ওরা। কাপড় ছাড়তে যাচ্ছে নিমা, নক হলো দরজায়। কবাট সামান্য একটু ফাঁক করে বাইরে তাকাল ও, দেখল হাতে একটা কাগজ নিয়ে করিডরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। 'এখানে এসেই লন্ডনে একটা ফ্যাক্স পাঠিয়ে ছিলাম, তার উত্তর এসে গেছে—ঘরে ঢুকে দেখি মেঝেতে পড়ে রয়েছে। ভদ্রবেশে আছেন তো?'

'এক মিনিট,' বলে দরজা বন্ধ করে দিল নিমা, খানিক পর আবার খুলল। 'আসুন।'

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল রানা। 'প্রক্সির মালিককে এখন আমরা চিনি, নিমা।'

'কে, বলুন!' দুই হাত মুঠো করল নিমা।

একটা চেয়ার টেনে এনে রানা বলল, 'বসুন।' নিমা বসার পর ফ্যাক্স পেপারের ভাঁজ খুলে চোখ বুলাল আরেকবার। 'প্রক্সির পঁয়ষট্টি ভাগ শেয়ারের মালিক ভনহালা মাইনিং কোম্পানী, বাকি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টের মালিক অস্ট্রিয়ার ইকো মেটালস। প্রক্সি এক্সপ্লোরেশন অস্ট্রেলিয়ার সিডনি স্টক এক্সচেঞ্জে রেজিস্ট্রি করা, শেয়ার ক্যাপিটাল বত্রিশ মিলিয়ন...'

'এত ডিটেলস কে শুনতে চায়! আপনি আমাকে লোকটার নাম বলুন!'

'ভনহালা আর ইকো, দুটোরই আবার মালিক ডিএমআই— ডয়েটস ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ। ডিএমআই-এর সমস্ত শেয়ারের মালিক হেস ডুগার্ড ফ্যামিলি ট্রাস্ট। দু'জন মাত্র ট্রাস্টি—হেস ডুগার্ড আর তাঁর স্ত্রী ইনগ্রিড।'

'হেস ডুগার্ড!' বিড়বিড় করল নিমা, এখনও রানার দিকে তাকিয়ে। 'সম্ভাব্য স্পনসর হিসেবে হাসলান চাচা তালিকায় তাঁর নাম রেখেছিল। উইলবার কিথের বইটা নিশ্চয়ই তিনি পড়েছেন। আমি জানি, জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে ওটা। আপনার মত তিনিও সম্ভবত চাচার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল রানা। 'কায়রো মিউজিয়ামের ভেতর আপনারা চাচা-ভাইঝি কি করছিলেন, এটা জেনে নেয়া কঠিন কোন ব্যাপার ছিল না। বাকিটা তো সবাই আমরা জানি।'

'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তিনি প্রক্সিকে ইথিওপিয়ায় নিয়ে গেলেন কিভাবে?'

'ব্যারি আমাকে জানিয়েছে, ওখানে তারা একটা কনসেশন পায় পাঁচ বছর

আগে। ক্লোল হাতে পাবার অনেক আগে থেকে ওখানে রয়েছেন হেস ডুগার্ড। শুধু বেস ক্যাম্পটা অ্যাবি খাদে সরিয়ে আনতে হয়েছে ওদেরকে। খোঁজ নিলে জানা যাবে জ্যাক রাফেল হেস ডুগার্ডের একজন ম্যাসলম্যান। কর্নেল ঘুমাও ওদের পকেটে।'

'সব কিছু মিলে যাচ্ছে,' বলল নিমা। 'বসকে রাফেলই ওখানে আমাদের পৌঁছানোর খবর দেয়। হেস ডুগার্ডের নির্দেশেই, গুন্ডাদের দিয়ে আমাদের ক্যাম্পে হামলা করা হয়।'

'যাক, এখন অন্তত আমরা জানি কার সঙ্গে লড়ছি।'

মাথা নাড়ল নিমা। 'এই কাজে হেস ডুগার্ডকে কেউ সাহায্য করছে। কায়রোর কোন লোক।'

রানা জানতে চাইল, 'আপনার মিনিস্টারের নামটা যেন কি?'

'আরে না!' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল নিমা। 'আতাহার আবু কাসিম হতে পারেন না! আমি তাঁকে সারাজীবন ধরে চিনি। অত্যন্ত সৎ মানুষ। সততার টাওয়ার বলব আমি।'

'মোটা টাকা ঘুষ পেলে এরকম বহু টাওয়ারকে কাত হয়ে যেতে দেখেছি আমি,' নরম সুরে বলল রানা, শুনে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল নিমা।

পরদিন সকালে পুলিস কমিশনারের গাড়ি হেডকোয়ার্টারে নিয়ে এল ওদেরকে। খুব আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন জেনারেল উর্মিদ মানামা। বেশ কিছু প্রশ্ন করলেন তিনি, ইন্সপেক্টর সালাম সব লিখে নিলেন। ভ্লাদিমির উস্তাভ যে কেজিবির অফিসার ছিল, ওরা সেটা জানে কিনা জিজ্ঞেস করা হলো। ইন্টারভিউ শেষ হতে একটা বিবৃতি টাইপ করা হলো, পড়ে দেখার পর সেটায় সই করল রানা। বিদায় দেয়ার সময় জেনারেল বললেন, 'যে-কোন ধরনের সাহায্য দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন, মি. রানা, স্যার।' এরপর নিমার দিকে তাকালেন তিনি। 'আমি আশা করব আবার আপনি ইথিওপিয়ায় বেড়াতে আসবেন।'

'আসব না মানে! কিছুদিনের মধ্যেই আবার আমাদেরকে দেখতে পাবেন আপনি!' হাসছে নিমা।

বাইরে বেরিয়ে এসে রানাকে বলল ও, 'সত্যি, এরকম ভাল মানুষ আজকাল দেখা যায় না।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল রানা।

পরদিন সকালে ডাইনিং রূমে ব্রেকফাস্ট করতে নেমে দু'জনেই ওরা একটা করে এনভেলাপ পেল, ডাইনিং টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে। ওয়েটারকে কফি দিতে বলে নিজের এনভেলাপটা খুলল রানা। পড়ার পর অবাক হয়ে তাকাল নিমার দিকে, বলল, 'জেনারেল মানামা আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন! আপনাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে দুপুরের আগে পুলিস হেডকোয়ার্টারে হাজির হবেন। মানে? প্লীজ বা থ্যাঙ্ক ইউ গেল কোথায়?'

'আমাকেও একই নির্দেশ দেয়া হয়েছে,' বলল নিমা। 'আমিও জানতে চাই,

এর মানে কি?'

'ওখানে না গেলে জানা যাবে না।'

আজ সকালে কিন্তু ওদের কপালে উষ্ণ অভ্যর্থনা জুটল না। গার্ড ওদেরকে জেনারেল চার্জ অফিসে পাঠিয়ে দিল। ওখানে ডেস্ক অফিসারের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী ভুল বোঝাবুঝির ঝামেলা শুরু হলো। লোকটা ইংরেজি প্রায় জানে না বললেই হয়। অবশেষে টেলিফোনে ফিসফিস করে কার সঙ্গে যেন কথা বলল সে, কথা শেষ করে দেয়াল ঘেঁষে ফেলা কাঠের বেঞ্চ দেখিয়ে বসতে বলল ওদেরকে।

চল্লিশ মিনিট গরমে সেদ্ধ হলো ওরা। চোর-বদমাশদের ধরে এনে জেরা করা হচ্ছে, এটা ছাড়া উপভোগ করার মত আর কিছু নেই এখানে। অবশেষে ইন্সপেক্টর সালামকে পার্টিশনের দরজায় দেখা গেল। কালকের মত হাসলেন না, মুখ হাঁড়ি করে আছেন, হাতছানি দিয়ে ডাকলেন ওদেরকে। এগিয়ে এসে হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা, ইন্সপেক্টর দেখতে না পাবার ভান করে ওদেরকে পথ দেখিয়ে পিছন দিকের একটা কামরায় নিয়ে এলেন। বসার কোন অনুরোধ এল না, রানাকে বলা হলো, 'আপনার দখলে একটা আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, সেটা হারিয়ে ফেলার জন্যে আপনিই দায়ী।'

'হ্যাঁ, আমি আমার স্টেটমেন্টে বলেছি...'

ওকে বাধা দিয়ে ইন্সপেক্টর সালাম বললেন, 'অবহেলা করে আগ্নেয়াস্ত্র হারানো অত্যন্ত সিরিয়াস অফেন্স।'

'আমার তরফ থেকে কোন অবহেলা হয়নি,' অস্বীকার করল রানা।

'অস্ত্রটার ওপর আপনি নজর রাখার ব্যবস্থা করেননি। স্টীল সেফে ভরে রাখার কোন চেষ্টা করেননি।'

'অ্যাবি খাদে স্টীল সেফ, ইন্সপেক্টর?'

'অবহেলা,' বললেন ইন্সপেক্টর। 'অপরাধতুল্য অবহেলা। আমরা জানব কিভাবে অস্ত্রটা সরকারবিরোধী দুষ্কৃতকারীদের হাতে পড়েনি?'

'আপনি বলতে চাইছেন অজ্ঞাত পরিচয় কোন ব্যক্তি একটা রিগবি দিয়ে সরকারকে উৎখাত করতে পারে?'

রানার বিদ্রূপ গ্রাহ্য না করে দেরাজ খুলে দুই প্রস্থ ডকুমেন্ট বের করলেন সালাম। 'এগুলো আপনাদের বহিষ্কার আদেশ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ইথিওপিয়া ছেড়ে যেতে হবে।'

অনেক তর্ক-বিতর্ক করেও কোন লাভ হলো না। অবশেষে রানা বলল, 'জেনারেল উর্মিদ মানামার সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি।'

'তিনি উত্তর সীমান্তে গেছেন, কয়েক হপ্তা পর ফিরবেন। প্লীজ, ডকুমেন্টে সই করুন।'

পরদিন ওদেরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়ার সময় ব্যারি গরডন বারবার একই কথা বলছে, 'মি. অ্যামব্যাসাডর সাংঘাতিক রেগে গেছেন। আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ তো জানিয়েছেনই, আরও যা যা করার সবই তিনি করবেন...'

'এটা নিয়ে এত হৈ-চৈ করার দরকার কি,' বলল রানা। 'দু'জনের কেউই

আমরা এখানে আর ফিরে আসতে ইচ্ছুক নই। কাজেই বলা চলে না যে আমাদের কোন ক্ষতি হয়েছে।'

'কিন্তু তুমি আমার বন্ধু, তাছাড়া ব্রিটিশ সাবজেক্ট···'

'সবই ঠিক, তবু এত গুরুত্ব না দিলেও চলে।'

কেনিয়া এয়ারওয়েজের টিকেট আগেই বুক করা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ে প্লেনে চড়ে বসল ওরা। বিদায়ের সময় গরডনকে খুব বিষণ্ণ দেখাল। 'ছুটিছাটায় লন্ডনে গেলে আমার খোঁজ কোরো,' উৎসাহ দিয়ে হাসল রানা।

প্লেন গড়াতে শুরু করেছে, এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙকে পাশ কাটিয়ে এল। হঠাৎ রানার পাশের সীটে আড়ষ্ট হয়ে গেল নিমা। 'দেখুন!' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। 'প্রক্সি!'

এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের দূর প্রান্তে একটা একজিকিউটিভ জেট এইমাত্র স্থির হলো। প্লেনটা সবুজ রঙ করা, লম্বা টেইল ফিন-এ আঁকা হয়েছে সেই লাল ঘোড়ার ছবি–পিছনের পায়ে ভর দিয়ে আছে, সামনের পা দুটো শূন্যে। ওরা তাকিয়ে আছে, জেটের দরজা খুলে গেল। অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে ছোট্ট একটা ভিড় তৈরি হয়েছে টারমাকে। জেটের দরজায় প্রথমে উদয় হলেন ছোটখাট একজন মানুষ, পরনে ক্রীম ট্রপিক্যাল সুট, মাথায় সাদা পানামা হ্যাট। আকার-আকৃতি যা-ই হোক, ভদ্রলোকের হাবভাবে আত্মবিশ্বাস আর কর্তৃত্বের ছাপ স্পষ্ট। মাথা উঁচু করে রাখার ভঙ্গিটা দম্ভ হতে পারে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর ধরনটা ক্ষমতার গর্ব হওয়া বিচিত্র নয়। তাঁর চোয়াল কঠিন, যেন সারাক্ষণ জেদ ধরে আছেন।

দেখামাত্র চিনতে পারল রানা। ক্রিস্টি সহ নামকরা দু'একটা অকশন ফ্লোরে বেশ কয়েকবারই হেস ডুগার্ডকে দেখেছে ও। 'হেস ডুগার্ড,' বিড়বিড় করল ও।

'আমার চোখে লাগছে ফণা তোলা গোক্ষুর!'

সিঁড়ি বেয়ে জেট থেকে তরতর করে নেমে আসছেন হেস ডুগার্ড।

'দেখে বিশ্বাস হয়, ভদ্রলোকের বয়েস সত্তর? জিজ্ঞেস করল রানা। 'চুল আর ভুরু রঙ করেছেন, তা না হলে এত কালো দেখাত না।'

'সর্বনাশ, এ আমি কাকে দেখছি!' হঠাৎ আঁতকে উঠল নিমা।

ছোট্ট ভিড়টা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন ব্লু ইউনিফর্ম পরা জেনারেল উর্মিদ মানামা। হেস ডুগার্ডকে স্যালুট করলেন তিনি।

'কি, বলিনি? হেস ডুগার্ডের পকেটে আরও কে কে আছে কে বলবে!'

'দেখুন, দেখুন!' আবার একবার আঁতকে উঠল নিমা, তাকিয়ে আছে জেটের দরজায়। এবার যে আরোহীটিকে ওখানে দেখা গেল তাঁর বয়েস বেশি নয়। সুদর্শন তরুণ, মাথায় ঢেউ খেলানো কালো চুল, মাথায় হ্যাট নেই। 'ওহ্ গড, কারিম ফারুকী!'

'কারিম ফারুকী···কে?'

'মিউজিয়ামে হাসলান চাচার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল। চাচার জায়গায় ওই এখন চাকরি করছে।'

টারমাক ধরে গড়াচ্ছিল ওদের প্লেন, হঠাৎ সেটার গতি বেড়ে গেল। প্রক্সির

জেট দৃষ্টিপথ থেকে সরে গেল। যে যার চেয়ারে হেলান দিল ওরা, বলা উচিত নেতিয়ে পড়ল।

'আর কোন সংশয় নেই। প্রতিপক্ষ কারা, পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকাল নিমা। 'হেস ডুগার্ড পাপেট-মাস্টার। আর কারিম ফারুকী তার শিকারী কুকুর। সন্দেহ নেই ফারুকীই কায়রোয় খুনীদেরকে ভাড়া করেছিল আমাদেরকে মেরে ফেলার জন্যে। ওহ্, রানা, চাচাকে কবর দেয়ার সময় ফারুকী কি বলেছিল তা যদি আপনি শুনতেন! চাচাকে নাকি পরম বন্ধু মনে করত সে, শ্রদ্ধা করত···'

নাইরোবি পৌঁছে প্লেন বদল করল ওরা, হিথরোতে পৌঁছুল পরদিন সকালে। ইতিমধ্যে ওরা দু'জন আলোচনা করে একটা প্ল্যান তৈরি করেছে, অ্যাবি গিরিখাদে ফিরে গিয়ে গহ্বরের ভেতর টাইটার পুল কিভাবে এক্সপ্লোর করা হবে।

লন্ডনে বৃষ্টি হচ্ছে। ট্যাক্সি নিয়ে রানার অফিস-কাম-রেসিডেন্সে পৌঁছুল ওরা। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল নিমা, ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে কয়েকটা জিনিস কিনে আনল রানা। দু'জন মিলে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে খেলো। খাওয়া শেষ হতে রানা বলল, 'ফলকের ফিল্মগুলো ডেভলপ করিয়ে আনুন আপনি, আমার রেনকোটটা ধার হিসেবে নিয়ে যান। এদিকে আমি জরুরী কয়েকটা ফোন সারি।'

নিমা বেরিয়ে যেতে প্রাইভেট সেক্রেটারি স্বাতী চৌধুরীকে ফোন করল রানা। নিজের ফিরে আসার খবর দিয়ে বলল, 'নোটবুক আর পেন্সিল নাও। তারপর শোনো কি কি করতে হবে তোমাকে।' দশ মিনিট ডিকটেশন দিল ও।

এরপর এক্স-রয়্যাল এঞ্জিনিয়ার টনি মারটিনকে ফোন করল রানা, ডেভনে। ডাইভিং ও আন্ডারওয়াটার কনস্ট্রাকশনে এক্সপার্ট সে, প্রয়োজনে রানা এজেন্সির সঙ্গে চুক্তিতে কাজ করে। উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে তৈরি একটা জাগুয়ার আছে তার, শখ বলতে সেটা খুলে আবার জোড়া লাগানো আর মাছ ধরা। দু'বার রিঙ হতে রিসিভার তুলল, ভেসে এল মারটিনের গলা, 'কে, হে?'

'রানা,' বলল ও। 'এজেন্সিরই কাজ, তবে ইংল্যান্ড ছেড়ে অনেক দূরে যেতে হতে পারে। একটু ঝুঁকিও আছে। সেই একই বেতন। রাজি?' কোন ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি প্রস্তাব দিল ও।

'ঠাট্টা কোরো না তো,' বলল মরটিন। 'তুমি ডাকলে কবে যাইনি? তবে বিস্তারিত সব জানতে হবে। কোথায় দেখা করব?'

'কাল আমার অফিস-কাম-ফ্ল্যাটে চলে এসো। পাইড রুলটা নিয়ে আসতে ভুলো না।' রানা জানে মারটিন পকেট কমপিউটর ব্যবহার করে না।

এরপর আদ্দিস আবাবায় ফোন করে ব্যারি গরডনকে চাইল রানা। গরডন লাইনে আসতেই বলল, 'মিস নিমা তোমাকে শুভেচ্ছা আর ভালবাসা জানিয়েছেন।'

'বিশ্বাস করতে পারলে খুশি হতাম,' জবাব দিল গরডন। 'তোমরা তাহলে ভালয় ভালয় পৌঁচেছ, কেমন?'

'হ্যাঁ, কোন অসুবিধে হয়নি,' বলল রানা। 'আমার একটা উপকার করতে হয়, ব্যারি। কর্নেল মুসা মনসুর, ইথিওপিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন। তুমি তাঁকে চেনো?'

'সজ্জন ব্যক্তি,' বলল গরডন। 'খুব ভাল করে চিনি। শনিবারে তাঁর সঙ্গে টেনিস খেলেছি। কেন, কি দরকার তাঁকে তোমার?'

'আমি একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি। তাঁকে তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবে। বলবে, ইমার্জেন্সী। প্লীজ, ব্যারি।' গরডনকে আর কোন প্রশ্ন করতে না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

এরপর একে একে আমস্টারডাম, আলজিয়ার্স, খার্তুম আর রাবাতে ফোন করল ও, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না নাসিমকে। কয়েক জায়গায় ফোন নম্বর দিয়ে রাখল, নাসিম যাতে বুঝতে পারে কে তাকে খুঁজছে।

আরও দুটো ফোন করল রানা, রিসিভার নামিয়ে রাখতেই কলিংবেল বেজে উঠল।

দরজা খুলে দিতে ভেতরে ঢুকল নিমা, কোটের পকেট থেকে হলুদ একটা প্যাকেট বের করে দেখাল রানাকে। 'আপনি সত্যি মাস্টার ফটোগ্রাফার। সবগুলো ছবি নিখুঁত হয়েছে। ফলকের প্রতিটি ক্যারেক্টর খালি চোখে পড়তে পারছি আমি। টাইটার সঙ্গে খেলাটায় আবার আমরা ফিরে এসেছি।'

ডেস্কের ওপর গ্লসি ফটোগ্রাফগুলো সাজাল ওরা, মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'আপনি দেখছি ডুপ্লিকেটও করিয়েছেন, গুড। নেগেটিভগুলো আমার ব্যাংকের সেফ ডিপোজিটে চলে যাবে। দ্বিতীয়বার ওগুলো হারাবার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

রানার বড় সাইজের ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে প্রতিটি প্রিন্ট এক এক করে স্টাডি করল নিমা, ফলকের চারটে সাইডেরই একটা করে সবচেয়ে পরিষ্কার প্রিন্ট আলাদা করল। 'এগুলো ব্যবহার করব আমরা। রাবিংগুলো না থাকায় খুব একটা অসুবিধে হবে না।' তারপর হায়ারোগ্লিফিক্স-এর একটা অংশ পড়তে শুরু করল, 'গোক্ষুর কুণ্ডলী ছাড়িয়ে মণি পরানো ফণা তুলল। প্রভাতের তারাগুলো তার চোখে ঝিলিক মারল। তার কালো আর পিচ্ছিল জিভ তিনবার চুমো খেলো বাতাসকে।' উত্তেজনায় গরম আর লালচে হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'এখানে টাইটা কি বলছে বুঝতে পারছি না।' উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে উঠল ও।

'ও-সব এখন রেখে দিন,' একটু কঠিন সুরে বলল রানা। 'আপনাকে আমি চিনি, একবার শুরু করলে সারাদিন আর উঠবেন না। প্রথমে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসুন, তারপর কাজের কথা ভাবা যাবে। উনি আপনাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন।'

হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল নিমা। 'হ্যাঁ, যাই তবে, রানা, আমাকে একবার দেশেও যেতে হবে।'

অবাক হলো রানা। 'দেশে মানে মিশরে?' নিমা মাথা ঝাঁকাতে আবার জানতে চাইল, 'কিন্তু কেন?'

'আমার পিতৃকুলের আত্মীয়স্বজন আছেন ওখানে, তাঁরা আমাকে অত্যা

ভালবাসেন,' বলল নিমা। 'তাছাড়া, আমার জীবনের প্রীতিকর সমস্ত স্মৃতিই তো কায়রোয়। আমাকে বাধা দেবেন না, প্লীজ।'

'কিন্তু বিপদের কথাটা ভাববেন না? আমি যে আপনার সঙ্গে যাব, তা-ও সম্ভব নয়–প্রস্তুতি নিতে হলে এখানে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে।'

'প্রক্সির মনোযোগ এখন ইথিওপিয়ার দিকে, মিশরের দিকে নয়,' বলল নিমা। 'তিন-চারদিনের বেশি থাকব না, কি আর হবে।'

হেরে গিয়ে অবশেষে রানা জানতে চাইল, 'কবে যেতে চান?'

'আজই সন্ধের ফ্লাইটে।'

বিকেলে নিমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়ার সময় রানা বলল, 'কর্নেল মুসা মনসুরের মাধ্যমে আমার বন্ধু অ্যালান শাফির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। আমার প্ল্যানে মূল চাবিই হলো শাফি। তার সাহায্য ছাড়া টাইটার সঙ্গে খেলাটায় আমরা অংশগ্রহণই করতে পারব না।'

এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙে অদৃশ্য হবার আগে নিমা বলল, 'ফিরে এসে যেন দেখি সব প্রস্তুতি শেষ।'

ছয়

কর্মচারীরা সবাই জানে ভদ্রলোক তাদের কাছ থেকে ঠিক কি আশা করেন। প্রতিটি জিনিস যেমনটি চান তেমনটিই পেলেন তিনি। কোয়ানসেট হাট-এর চারদিকে সপ্রশংস দৃষ্টি বুলালেন হেস ডুগার্ড। বস্-এর আগমন উপলক্ষ্যে বেসটাকে ভালভাবেই সাজিয়েছে রাফেল।

লম্বা পোর্টেবল বিল্ডিঙের অর্ধেকটাই দখল করে রেখেছে তাঁর নিজের প্রাইভেট কোয়ার্টার। ভেতরে জীবাণুনাশক স্প্রে আর এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহার করা হয়েছে। কাবার্ডে ঝুলছে তাঁর কাপড়চোপড়, কসমেটিক্স আর মেডিসিন সাজানো হয়েছে বাথরুম কেবিনেটে। প্রাইভেট কিচেনে সব রকম ইকুইপমেন্ট রাখা হয়েছে, তাঁর প্রিয় ডিশ তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণেরও কোন অভাব নেই। সঙ্গে করে নিজের চাইনীজ শেফকেও তিনি নিয়ে এসেছেন।

হেস ডুগার্ড নিরামিষভোজী, অধূমপায়ী ও টিটোটেলার। চা, মদ আর মাংস তিনি বিশ বছর আগে পরিত্যাগ করেছেন। তখন তিনি মোটা ছিলেন, চোখের নিচে কালচে পোঁটলা ঝুলত। এখন তিনি একহারা, চামড়ায় যথেষ্ট লাবণ্য ফিরে পেয়েছেন। শক্তির বিচারে এখনও তাঁকে তরুণই বলা যায়, অথচ বয়েস হয়েছে সত্তর।

সেই যৌবন কাল থেকেই শারীরিক চাহিদাকে দমিয়ে রেখে মনের চাহিদাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি। মানুষ বা জীবিত কোন প্রাণীর চেয়ে জড়পদার্থকেই বেশি মূল্য দিয়েছেন। যে রাজমিস্ত্রী হাজার বছর আগে মারা গেছে, তার হাতে খোদাই

... যে-কোন সুন্দরীর নরম দেহের চেয়ে বেশি উত্তেজিত করে তাঁকে। তিনি শৃংখলা পছন্দ করেন, কর্তৃত্ব ফলাতে ভালবাসেন।

তাঁর বিশাল সংগ্রহে অমূল্য সব প্রাচীন বস্তু রয়েছে, সবই অন্য লোকদের আবিষ্কার করা। জীবনে এই একবার সুযোগ পেয়েছেন তিনি নিজে কিছু আবিষ্কার করার, একজন ফারাও-এর সমাধি ভেঙে ভেতরে ঢুকবেন, চার হাজার বছরের মধ্যে তিনিই হবেন প্রথম মানুষ যিনি নিজের চোখে দেখবেন কি আছে সেখানে। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছেন হেস ডুগার্ড, পারেন না এমন কোন কাজ নেই। এরইমধ্যে কিছু মানুষ মারা গেছে, আরও কিছু মারা গেলে তাঁর কিছু আসে যায় না। কোন মূল্যই তাঁর কাছে বেশি নয়।

প্রমাণ সাইজের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখলেন হেস ডুগার্ড। ঘন, কর্কশ, কালো চুলে আঙুল চালালেন। অবশ্যই কলপ লাগানো, শরীর বা চেহারার এইটুকু যত্ন তাঁকে নিতেই হয়। কাঠের মেঝে ধরে এগিয়ে এসে কনফারেন্স রুমের দরজা খুললেন তিনি।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। টেবিলের মাথার দিকে এগিয়ে এলেন হেস ডুগার্ড, দাঁড়ালেন কার্পেট মোড়া নিচু ও ছোট একটা মঞ্চের ওপর। এই মঞ্চটা সঙ্গে নিয়ে বেড়ান তিনি। মাত্র নয় ইঞ্চি উঁচু ওটা। পুরুষ ও মহিলাদের দিকে এই উঁচু মঞ্চ থেকে তাকান তিনি। বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন, সবাইকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে। সবার চেয়ে উঁচু হয়ে থাকে তাঁর মাথা।

প্রথমে তিনি জ্যাক রাফেলের দিকে তাকালেন। টেক্সান রাফেল এক যুগ ধরে তাঁর কাজ করছে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত, গায়ে গণ্ডারের মত শক্তি, মনটাও ইস্পাতের মত কঠিন। কোন প্রশ্ন ছাড়াই যে-কোন আদেশ পালন করা তার প্রধান গুণ। পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে যে-কোন কাজ দিয়েই পাঠানো হোক তাকে, সম্ভাব্য কম ঝামেলার মধ্যে কাজ সেরে নিরাপদে ফিরে আসবে।

এরপর হেস ডুগার্ড সুন্দরী মহিলার দিকে তাকালেন। ক্যান্ডি ক্যাম্পবেল তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি। মনিবের সমস্ত ব্যক্তিগত দিকগুলো দেখেন তিনি। ওঁর অনুমতি ছাড়া হেস ডুগার্ডের সঙ্গে কেউ দেখা করতে পারে না। ক্যাম্পবেল হেস ডুগার্ডের কমিউনিকেশন এক্সপার্টও বটে। হাট-এর একদিকের দেয়ালে থরে থরে সাজানো ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টগুলোর নিয়ন্ত্রণ ওঁর হাতে। বয়েস প্রায় চল্লিশ হলেও দেখে আরও কম মনে হয়। দেখতে খুবই সুন্দর।

হেস ডুগার্ডের স্ত্রী, ইনগ্রিড, আজ বিশ বছর হলো প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী। সেই থেকে খালি জায়গাটা পূরণ করছেন ক্যাম্পবেল।

টেবিলের ওপর নিজের সামনে রেকর্ডিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে বসেছেন ক্যাম্পবেল। তাঁকে ছাড়িয়ে হেস ডুগার্ডের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল আরও দু'জন কর্মচারীর ওপর।

আদ্দিস আবাবা থেকে জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টারে চড়ে নাইল গিরিখাদের চূড়ায় নিজেদের বেস ক্যাম্পে আজ সকালে পৌঁচেছেন হেস ডুগার্ড, হেলিকপ্টার থেকে নামার সময় আজই প্রথম কর্নেল ঘুমাকে দেখেছেন। কর্নেল সম্পর্কে খুব

কমই জানেন তিনি, তবে রাফেলের নির্বাচন মন্দ হবে না বলে ধরে নিয়েছিলেন। কর্নেলের কাজ সম্পর্কে রাফেল সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও, তিনি নিজে ঠিক তৃপ্ত হতে পারেননি। এরইমধ্যে দায়িত্ব পালনে গাফিলতির পরিচয় দিয়েছেন কর্নেল ঘুমা। মাসুদ রানা আর ঈজিপশিয়ান মেয়েটাকে মুঠোয় পেয়েও বেরিয়ে যেতে দিয়েছেন। আফ্রিকায় বহু বছর ধরে অপারেশন চালাচ্ছেন ডুগার্ড, কালো মানুষদের ওপর তাঁর কোন শ্রদ্ধাবোধ জন্মায়নি। কর্নেল ঘুমা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। তবে আপাতত তাঁর সার্ভিস দরকার হবে। হাজার হোক দক্ষিণ গোজামের মিলিটারি কমান্ডার কর্নেল। চিন্তার তেমন কিছু নেই, কাজ ফুরালে উটকো ঝামেলা সরিয়ে ফেলা যাবে। রাফেলই সে-ব্যবস্থা করবে। কিভাবে কি করা হলো বিশদ জানতে চাইবেন না ডুগার্ড।

টেবিলে দাঁড়ানো শেষ লোকটার দিকে তাকালেন তিনি। এ আর এক লোক, আপাতত যাকে তাঁর খুব দরকার। কারিফ ফারুকীই প্রথম তাঁকে সপ্তম স্ক্রোল সম্পর্কে সচেতন করেন। যতটুকু তিনি শুনেছেন, ওই স্ক্রোলের সূত্র ধরে একজন ইংরেজ লেখক একটা থ্রিলার উপন্যাস লিখেছেন। না, উপন্যাসটি তিনি পড়েননি। এ-সব ছাই-পাঁশ কখনোই তাঁর পড়তে ইচ্ছে করে না। কথাটা সত্যি, ফারুকী সচেতন না করলে একজন ফারাও-এর গুপ্তধন উদ্ধারের এই সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত থেকে যেতেন।

আদি স্ক্রোলটা অনুবাদ করেন আল হাসলান, কাজটা শেষ হওয়া মাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফারুকী। ইতিহাসে রেকর্ড করা হয়নি এমন একজন ফারাও আর তাঁর সমাধির অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা। সেই থেকে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন তাঁরা। হাসলান আর তাঁর ভাইঝি স্ক্রোলের সূত্র ধরে তদন্ত চালাচ্ছিলেন, তাঁদের তদন্তের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে জানার পর ফারুকীকে তিনি ওদের ব্যবস্থা করতে বলেন, বলেন স্ক্রোলটা তাঁর চাই।

স্ক্রোলটা এখন তাঁর কালেকশনের অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে, অন্যান্য অমূল্য সম্পদের সঙ্গে ইস্পাত আর কংক্রিটের ভল্টে রেখে দিয়েছেন যত্ন করে। স্কল্স্ পাহাড়ের নিচে তাঁর নিজের একটা নিভৃত দুর্গ আছে, ভল্টটা সেখানে।

তবে ফারুকী তাঁর উপকার যেমন করেছেন, অপকারও কম করেননি। হাসলান আর তাঁর ভাইঝিকে মেরে ফেলার দায়িত্বটা তাঁকে দেয়া উচিত হয়নি। উচিত ছিল প্রফেশনাল কাউকে পাঠানো। কিন্তু ফারুকী জেদ ধরে বলেছিলেন কাজটা তিনি নিখুঁতভাবে সারতে পারবেন। এর জন্যে মোটা টাকা নেন তিনি, অথচ গোটা ব্যাপারটা লেজেগোবরে করে ছাড়েন। কাজেই, সময় হলে, ফারুকীকেও সরিয়ে ফেলা হবে। তবে এই মুহূর্তে ওঁকে তাঁর দরকার।

সন্দেহ নেই ঈজিপ্টোলজি আর হায়ারোগ্লিফিক্স-এ ফারুকী একজন এক্সপার্ট। হবে না, সারাজীবন এ-সব নিয়েই তো পড়ে আছেন। তিনি নিজেও কিছু কিছু বোঝেন বৈকি, তবে উৎসাহী অ্যামেচার ছাড়া আর কিছু বলা যায় না তাঁকে। স্ক্রোল ছাড়াও নতুন যে-সব উপকরণ পাওয়া গেছে, সবই গড় গড় করে পড়তে পারেন ফারুকী, যেন বন্ধুকে লেখা চিঠির মতই সহজপাঠ্য। ওর সাহায্য নিয়ে ফারাও মামোস-এর সমাধি খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী তিনি।

'বসুন সবাই, বসুন, প্লীজ,' বললেন হেস ডুগার্ড। 'আসুন শুরু করি আমরা।'

সবাই বসার পরও খুদে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেন ডুগার্ড। সবার চেয়ে উঁচু হয়ে থাকতে ভালবাসেন তিনি। 'একটা কথা পরিষ্কার বলে দিতে চাই। এই কামরা থেকে কোন পেপার, ডকুমেন্ট, নোট ইত্যাদি বাইরে বেরুতে পারবে না। এখানকার সব কিছুই অত্যন্ত কনফিডেনশিয়াল, এবং আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ফ্রয়লিন ক্যাম্পবেল আপনাদেরকে একটা করে ডকুমেন্ট ফোল্ডার দেবেন, মীটিং শেষে ওগুলো আবার তাঁর কাছে ফিরে যাবে। আমার ইচ্ছা আর নির্দেশের এদিক ওদিক হলে তার পরিণতি ভাল হবে না।'

সবাইকে একটা করে ফোল্ডার বিলি করলেন প্রাইভেট সেক্রেটারি ক্যান্ডি ক্যাম্পবেল। টেবিল থেকে ডোশিয়ে তুলে খুললেন ডুগার্ড। 'আপনাদের ফোল্ডারে মাসুদ রানার ক্যাম্প থেকে সংগ্রহ করা পোলারয়েড ফটোগ্রাফির কপি আছে। প্লীজ, ওগুলো দেখুন।'

সবাই যে যার ফোল্ডার খুলল।

'স্টাডি করার পর ড. ফারুকী বলছেন ফটোগ্রাফে যে ফলকটা দেখা যাচ্ছে সেটা জেনুইন, প্রাচীন ঈজিপশিয়ান আর্টিফ্যাক্ট, প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে যে সেকেন্ড ইন্টারমিডিয়েট পিরিয়ড সতেরোশো নব্বুই বি. সি.-র। আপনি নতুন আর কিছু বলতে চান, ড. ফারুকী?'

'ধন্যবাদ, হের হেস ডুগার্ড,' বলে হাসলেন ফারুকী, নার্ভাস দেখাচ্ছে তাঁকে। জার্মান ধনকুবেরের আচরণে ঠাণ্ডা এমন কিছু আছে যা তাঁকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। হাসলান আর নিমাকে খুন করার নির্দেশ দেয়ার সময় ভদ্রলোকের মধ্যে এক বিন্দু উত্তেজনা বা আবেগ দেখেননি তিনি। জানেন, তাঁকে খুন করার জন্যে অন্য কাউকে নির্দেশ দেয়ার সময়ও একদম নির্লিপ্ত দেখাবে ডুগার্ডকে। কোন সন্দেহ নেই, স্বেচ্ছায় বাঘের পিঠে চড়ে বসেছেন তিনি। 'আমি আমার আগের কথাই রিপিট করতে চাই। এই প্রিন্টের ফলকটা জেনুইন বলেই মনে হচ্ছে। তবে নিশ্চিত হবার জন্যে ফলকটা আমাকে দেখতে হবে।'

'সেটা যাতে আপনি দেখার সুযোগ পান তার ব্যবস্থা করার জন্যেই এখানে আমরা মিলিত হয়েছি,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন ডুগার্ড। 'এখন আপনার মতামত দিন, প্লীজ। ফলকটা যদি জেনুইন হয়, কোথায় পাওয়া যাবে? মানে, কোথায় আমরা খুঁজব?'

'শুধু ফলকটার কথা ভাবলে চলবে না,' বললেন ফারুকী। 'কর্নেল ঘুমা যে পোলারয়েড সংগ্রহ করেছেন সেগুলোও বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে।' নিজের ফোল্ডার থেকে একটা ফটোগ্রাফ বেছে নিলেন তিনি। 'এই যেমন এটা।' তাঁর দেখাদেখি বাকি সবাইও যে যার ফোল্ডার থেকে নির্দিষ্ট ওই ফটোগ্রাফটা হাতে নিল।

'ফলকটার পিছনে তাকালে দেখতে পাবেন ছায়ার ভেতর একটা গুহার দেয়াল রয়েছে,' আবার বলল ফারুকী, ডুগার্ড উৎসাহ দিয়ে হাসলেন। 'আরও রয়েছে বার লাগানো একটা দরজা বা প্রবেশ পথ।' হাতেরটা রেখে দিয়ে আরেকটা ফটো তুললেন। 'এবার এটা দেখুন। অন্য এক সাবজেক্টের ছবি।

দেয়ালচিত্র বলব আমি, প্লাস্টার করা দেয়ালে বা কোন গুহার মসৃণ পাথরের ওপর আঁকা হয়েছে। সম্ভবত গ্রিল বা বার লাগানো দরজার ভেতর ক্যামেরা গলিয়ে এই দেয়ালচিত্রের ছবি তোলা হয়েছে। দেয়ালচিত্রে ঈজিপশিয়ান স্টাইলের ছাপ ও প্রভাব স্পষ্ট। আপার ঈজিপ্টের কুইন লসট্রিসের সমাধিতে এ-ধরনের দেয়ালচিত্র আছে, ওখান থেকে আদি টাইটা স্ক্রোল উদ্ধার করা হয়। কাজেই আমার ধারণা, ওই একই গুহা বা সমাধি থেকে এসেছে এই ফলক আর দেয়ালচিত্রের ছবি।'

'তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াল, ছবিগুলো মাসুদ রানা কোত্থেকে তুলেছেন। কর্নেল ঘুমা, এলাকাটা আপনি চেনেন। শোনা যাক এ-ব্যাপারে আপনার কি বলার আছে।'

অনেক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর সিদ্ধান্তে আসা হলো, ছবিগুলো তোলা হয়েছে একটা কপটিক ক্রিশ্চান চার্চের ভেতর থেকে। রানার ক্যাম্প থেকে স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করেছেন কর্নেল ঘুমা, একটা ফটোয় লাল কালির বৃত্ত দেখা যাচ্ছে। ক্যাম্পসাইট থেকে মাত্র এক মাইল দূরে জায়গাটা। বৃত্তের ভেতর ওটা সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের মঠ।

'ওই মঠ সার্চ করা হোক,' নির্দেশ দিলেন ডুগার্ড। 'কর্নেল ঘুমা, ওখানে আপনার লোকজন ঢুকতে পারবে?'

'কেন পারবে না, হের ডুগার্ড? মঠের একজন সন্ন্যাসী আমার নিজের লোক। তাছাড়া, গোজাম এলাকায় এখনও মার্শাল ল বলবৎ রয়েছে, আর আমি ওখানকার কমান্ডার। বিদ্রোহী বা চোর-ডাকাতদের ধরার জন্যে যে কোন জায়গা আমি সার্চ করতে পারি।'

'ভেরি গুড,' বললেন ডুগার্ড। 'ওই ফলকটা আমি চাই।'

কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে তাঁকে স্যালুট করলেন কর্নেল ঘুমা।

কর্নেল ঘুমা শুধু নাস্তিক নন, জীবনে এমন কোন দুষ্কর্ম নেই যা তিনি করেননি। তাঁর অধীনস্থ সৈনিকরাও বেশিরভাগ এক সময় গুণ্ডা বা ডাকাত ছিল। তাদের মধ্যে থেকে বিশজনকে বাছাই করলেন তিনি, জানেন ধর্ম বা নৈতিকতার প্রতি তাদের কোন মোহ নেই। ভোর হবার দু'ঘণ্টা আগে নিরাপদ প্রক্সি কমপাউন্ডে প্যারেড করালেন তাদের, তারপর ফ্লাডলাইটের নিচে দাঁড় করিয়ে ব্রিফ করলেন। কাছেই জেট রেঞ্জার তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে, কন্ট্রোলে বসে আছে পাইলট। অস্ত্রশস্ত্র সহ এতগুলো লোককে একবারে বহন করা সম্ভব হবে না, কাজেই ঠিক হয়েছে চারবারে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রথম ফ্লাইটে ঘুমা থাকলেন, সঙ্গে কারিফ ফারুকী। মঠ থেকে তিন মাইল দূরে 'কপ্টার ওদেরকে নামিয়ে দিল, ডানডেরা নদীর কিনারা ঘেঁষে ফাঁকা একটা জায়গায়। এই একই জায়গায় মিলিত হয়েছিল তারা রানার ক্যাম্পে হামলা চালাবার আগে।

ভোরের প্রথম আলোয় মঠে পৌঁছুনোর প্ল্যান করেছেন কর্নেল। কনটিনজেন্ট নিয়ে পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন, রাবার সোল লাগানো প্যারাট্রুপার বুট থেকে প্রায় কোন শব্দই হচ্ছে না।

পাথুরে টেরেস বা চাতাল ফাঁকা পড়ে আছে। আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাথেড্রাল থেকে

পুরোহিত আর সন্ন্যাসীদের সম্মিলিত প্রার্থনাসঙ্গীতের একটানা ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ ভেসে আসছে। মাঝে মধ্যে বিরতি নিচ্ছেন তাঁরা, তখন শুধু প্রধান পুরোহিতের গলা শোনা গেল। দরজাগুলোর সামনে সৈনিকদের নিয়ে থামলেন কর্নেল। কাউকে কোন নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন নেই, সবাই জানে কার কি কাজ। সবার ওপর একবার চোখ বুলালেন তিনি, তারপর লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালেন।

চার্চের আউটার চেম্বার খালি। সন্ন্যাসীরা জমায়েত হয়েছেন মিডল্ চেম্বারে। ভেতরে ঢুকে আউটার চেম্বারের মেঝে পেরিয়ে এলেন কর্নেল, পিছনে ডিটাচমেন্ট। মিডল্ চেম্বারে ঢোকার দরজা খোলা দেখা গেল। ভেতরে ঢুকলেন তিনি, তাঁর লোকজন দু'সারিতে ভাগ হয়ে সাইড ওয়াল ঘেঁষে পজিশন নিল, হাতের অ্যাসল্ট রাইফেল কক ও লক করা, ডগায় আটকানো বেয়নেট হাঁটু গেড়ে প্রার্থনারত ভক্তদের কাভার দিচ্ছে।

ব্যাপারটা নিঃশব্দে ও দ্রুত ঘটে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীরা টের পেলেন যে তাদের পবিত্র স্থানে বৈরী একদল লোক ঢুকে পড়েছে। ঢাক-ঢোল পেটানোর আওয়াজ থেমে গেল, থেমে গেল প্রার্থনাসঙ্গীত, গাঢ় মুখগুলো পিছন ফিরে সশস্ত্র লোকজনকে দেখছে। একা শুধু প্রধান পুরোহিত ওলি জারকাস সচেতন নন, চোখ বুজে নিবিষ্টচিত্তে প্রার্থনা করছেন এখনও।

নিস্তব্ধতার ভেতর এগোলেন কর্নেল ঘুমা, হাঁটু গেড়ে বসে থাকা সন্ন্যাসীদের লাথি মেরে পথ থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। ওলি জারকাসের হাড়সর্বস্ব কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকি দিলেন, তারপর ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন মেঝেতে। প্রধান পুরোহিতের মাথা থেকে খসে পড়ল মুকুটটা।

সন্ন্যাসীদের দিকে ফিরে অ্যামহ্যারিক ভাষায় কর্নেল বললেন, 'চোর-ডাকাত আর গুণ্ডাবদমাশদের খোঁজে গোটা মঠ সার্চ করা হবে। আমার লোকজনকে কর্তব্য পালনে বাধা দিলে পরিণতি হবে ভয়াবহ।'

ক্রল করে তাঁর দিকে ঘুরলেন ওলি জারকাস, এমব্রয়ডারি করা পর্দা ধরে অনেক কষ্টে সিধে হলেন। স্পষ্ট ও কঠিন সুরে বললেন, 'এটা আমাদের পবিত্র স্থান। এখানে আমরা পরম পিতা, সন্তান ও পবিত্র আত্মার আরোধনা করি।'

'চোপ ব্যাটা!' গর্জে উঠলেন কর্নেল ঘুমা, হোলস্টার থেকে টোকারেভ পিস্তল বের করে তাক করলেন প্রধান পুরোহিতের বুকে।

হুমকিটা গ্রাহ্য না করে ওলি জারকাস বললেন, 'এখানে কোন গুণ্ডা নেই। আমরা সবাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যীশু ও পরম পিতার নামে বলছি, আপনারা চলে যান, আমাদেরকে নির্বিঘ্নে...

পিস্তলটা উল্টো করে ওলি জারকাসের চোয়ালে প্রচণ্ড বাড়ি মারলেন কর্নেল, গালটা তরমুজের মত ফেটে গিয়ে লাল হয়ে উঠল। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলেন প্রধান পুরোহিত, পর্দা ধরে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি গোঙাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে সন্ন্যাসীরাও।

হেসে উঠে ওলি জারকাসের পায়ে ল্যাং মারলেন কর্নেল। মেঝেতে একটা রক্তাক্ত স্তূপে পরিণত হলেন প্রধান পুরোহিত। 'বুড়ো বেবুন, কোথায় তোর গড?

যত জোরে পারিস ডাক, কোন সাড়া পাবি না।' হেসে উঠলেন ঘুমা, পিস্তল নেড়ে লেফটেন্যান্টিকে সংকেত দিলেন।

মিডল চেম্বারে ছ'জনকে পাহারায় রেখে মাকডাস-এর দিকে এগোলেন কর্নেল। দরজায় তালা দেয়া দেখে লেফটেন্যান্ট সবাইকে পিছিয়ে যেতে বলে হাতের একে-ফরটিসেভেন তুলে গুলি করল। বদ্ধ জায়গার ভেতর এক পশলা গুলি বিকট আওয়াজ করল, সেটা থামার পর শোনা গেল সন্ন্যাসীরা একযোগে বিলাপ শুরু করেছে।

কাঁধের ধাক্কায় বিশাল দরজা পুরোপুরি খুলে ফেলা হলো। ভেতরে কয়েকটা মাত্র কুপি জ্বলছে। হঠাৎ এমন কি নাস্তিকরাও এই পবিত্রতম স্থানে ঢুকতে ইতস্তত করছে। বুঝতে পেরে হাঁক ছাড়লেন কর্নেল, 'ফারুকী! এদিকে আসুন! হের ড্রুগার্ড আপনাকেই জিনিসটা খুঁজে বের করতে বলেছেন।'

একটা ঢোক গিলে মাকডাস-এ ঢুকলেন ফারুকী, টর্চ হাতে তাঁর পিছনেই থাকলেন ঘুমা। টর্চের আলো উপহার সামগ্রী ভরা শেলফ, রঙিন কাঁচ আর মূল্যবান পাথর, তামা আর রূপো, সোনা আর দেয়ালচিত্রের ওপর নাচানাচি করছে। আলোটা থামল উঁচু সিডারউড বেদির ওপর, উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এপিফানি মুকুট, পানপাত্র আর রূপালি কপটিক ক্রস।

'বেদির সামনে!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল ফারুকী। 'গ্রিল লাগানো দরজা! এখান থেকেই পোলারয়েড ছবি তোলা হয়েছে!' গ্রিল ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলেন। 'আলো, আলো!'

কাপড় মোড়া ট্যাবট পাথরটাকে পাশ কাটিয়ে তাঁর দিকে ছুটে এলেন কর্নেল, গ্রিলের ভেতর টর্চের আলো ফেললেন।

এতক্ষণ চিৎকার করছিলেন ফারুকী, এখন গলা থেকে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না, আবেগে ফিসফিস করছেন, 'এগুলো প্রাচীন দেয়ালচিত্র। কোন সন্দেহ নেই; ক্রীতদাস টাইটার কাজ!' কর্নেলের দিকে তাকালেন তিনি। 'দরজাটা ভাঙতে বলুন!'

কিন্তু প্রাচীন হলেও কাঠামোটা এখনও সাংঘাতিক মজবুত, সবাই মিলে চেষ্টা করেও নড়ানো গেল না। কর্নেলের নির্দেশে কয়েকজন ট্রুপারকে নিয়ে একজন জুনিয়ার অফিসার ছুটল সন্ন্যাসীদের কোয়ার্টার সার্চ করতে, গ্রিলের গেট ভাঙার জন্যে যন্ত্রপাতি দরকার।

ওরা চলে যেতে গ্রিল গেটের দিকে পিছন ফিরলেন কর্নেল। 'ফলকটার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি,' বলে মাকডাস-এর চারদিকে টর্চের আলো ফেললেন। কাপড় মোড়া ট্যাবট পাথরে স্থির হলো আলো। 'বোধহয় এটাই!' রূপো আর সোনার তৈরি সুতোয় এমব্রয়ডারি করা কাপড়টা ভারী বলে মনে হলো। সেটা ধরে টান দিলেন ঘুমা।

টাইটার স্টোন টেস্টামেন্ট, খোদাই করা ফলক বা পিলার, উন্মোচিত হলো। 'ফটোতে এই পাথরটাই দেখেছি আমরা!' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'হের ড্রুগার্ড এটাই চেয়েছেন! আমরা সবাই রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেলাম!'

এগিয়ে এসে ফলকটার সামনে হাঁটু গাড়লেন ফারুকী, আলিঙ্গন করলেন

পিছনে ফারুকী থাকলেন।

হেস ডুগার্ড রাজধানীর এয়ারপোর্টে পৌছুলেন কোম্পানীর হেলিকপ্টারে চড়ে, সঙ্গে রয়েছেন ক্যান্ডি ক্যাম্পবেল। ওঁরা পৌছুবার কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজির হলেন পুলিশ কমিশনার জেনারেল উর্মিদ মানামা। হের ডুগার্ডকে বিদায় জানাতে এসেছেন তিনি।

ত্রিশ ঘণ্টার কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে প্রক্সি ট্রাকও সময়মতই পৌছুল। কাঠের বাক্সগুলো যখন হের ডুগার্ডের প্রাইভেট জেটে তোলা হচ্ছে, জেনারেল উর্মিদ মানামা তখন ডিউটিরত কাস্টমস অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন। 'জিওলজিক্যাল স্যামপল' হিসেবে ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়েছে, তাতে সই করে নিঃশব্দে বিদায় নিলেন অফিসার।

একুশশো ঘণ্টায় ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল জেট প্লেনটা। সিনিয়র কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন অফিসার যারা অপেক্ষা করছেন তাঁরা সবাই হের ডুগার্ডের পুরানো বন্ধু, খবর পাওয়ামাত্র এয়ারপোর্টে চলে আসেন। আনুষ্ঠানিকতা শেষে জেটে বসে হুইস্কি খেলেন তাঁরা, প্রত্যেককে একটা করে মোটাতাজা এনভেলাপ দেয়া হলো।

বাকি রাতটুকু পাহাড়ী পথ ধরে ছুটল ট্রাক। তেরপল দিয়ে ঢাকা ট্রাকটাকে অনুসরণ করছে হের ডুগার্ডের শোফার, কার্গো বা ট্রাক মুহূর্তের জন্যে চোখের আড়াল হতে দিচ্ছে না। ভোর পাঁচটার দিকে লোহার গেট দিয়ে দুর্গের ভেতর ঢুকল গাড়ি। দুর্গটা আকারে বিশাল, পরিবেশটাও ভৌতিক। বাটলার থেকে শুরু করে কর্মচারীরা সবাই মনিবের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ডুগার্ডের কালেকশন দেখাশোনা করেন বেন ফার্গুসন, তিনিও স্টাফসহ উপস্থিত। বাক্স দুটো ফর্কলিফটে তোলা হলো, ভল্টে নিয়ে যাওয়া হবে।

কাঠের বাক্স খোলা হচ্ছে, দুর্গের উত্তর টাওয়ারে চলে এলেন ডুগার্ড। গোসল সেরে ব্রেকফাস্ট করলেন, পাশেই দাঁড়িয়ে থাকল চাইনিজ শেফ। নাস্তা শেষ করে স্ত্রীর বেডরুমে চলে এলেন তিনি। আগের চেয়ে রোগা আর নিষ্প্রভ লাগল ভদ্রমহিলাকে। সব চুলই একদম সাদা হয়ে গেছে, মুখ দেখে মনে হচ্ছে মোমের তৈরি। নার্সকে বিদায় করে দিয়ে স্ত্রীর কপালে চুমো খেলেন ডুগার্ড। কর্কট রোগ ধীরে ধীরে খেয়ে ফেলছে মহিলাকে, তবু ডুগার্ডকে তিনি এক জোড়া পুত্রসন্তান উপহার দিয়েছেন, এই কথাটা মনে রেখে এখনও স্ত্রীকে ভালবাসেন ডুগার্ড।

স্ত্রীর সঙ্গে এক ঘণ্টা কাটিয়ে নিজের বেডরুমে চলে এলেন তিনি, ঘুমালেন চার ঘণ্টা। যতই ক্লান্ত হন, এর বেশি ঘুম তাঁর দরকার হয় না। দুপুর পর্যন্ত ব্যবসার কাগজ-পত্র দেখলেন তিনি। তারপর তত্ত্বাবধায়ক ফার্গুসন ইন্টারকমে জানালেন, তাঁরা সবাই তাঁর জন্যে ভল্টে অপেক্ষা করছেন।

প্রাইভেট সেক্রেটারি ক্যাম্পবেলকে সঙ্গে নিয়ে এলিভেটরে চড়লেন ডুগার্ড। এলিভেটরের দরজা খোলার পর দেখা গেল ফার্গুসন ও ফারুকী অপেক্ষা করছেন। একবার চোখ বুলাতেই ডুগার্ড বুঝতে পারলেন দু'জনেই উত্তেজনায় অস্থির হয়ে আছেন। 'এক্স-রে শেষ হয়েছে?' আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজ ধরে ভল্টের দিকে যাবার সময় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'জ্বী, হের ডুগার্ড!' ফার্গুসন জবাব দিলেন। বয়েসে তিনি প্রৌঢ়, আর্কিওলজি নিয়ে অক্সফোর্ড থেকে পিএইচডি করেছেন, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। 'টেকনিশিয়ানরা দারুণ কাজ দেখিয়েছে। প্লেটগুলো ভারি চমৎকার হয়েছে।'

সংশ্লিষ্ট ক্লিনিকে নিয়মিত চাঁদা দেন ডুগার্ড, কাজেই তাঁর যে-কোন অনুরোধ রাজকীয় আদেশ বলে গণ্য করা হয়। ক্লিনিকের ডিরেক্টর তাঁর সবচেয়ে আধুনিক পোর্টেবল এক্স-রে ইকুইপমেন্ট সহ দু'জন টেকনিশিয়ানকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সঙ্গে একজন সিনিয়র রেডিওলজিস্ট। লর্ড হারাব-এর ছবি তোলা হয়েছে। প্লেটগুলো স্টাডি করে রিপোর্ট তৈরি করেছেন রেডিওলজিস্ট।

স্টীল ভল্টের তালায় প্লাস্টিক পাস কার্ড ঢোকালেন ফার্গুসন, হিস হিস শব্দ তুলে দরজা খুলে গেল। সবার আগে ভেতরে ঢুকলেন ডুগার্ড। ভেতরে ঢুকে ভল্টের চারদিকে চোখ বুলালেন তিনি। বরাবরের মত উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে এল তাঁর।

ভল্টের দেয়াল দুই মিটার পুরু, ইস্পাত আর কংক্রিট দিয়ে তৈরি। ভল্টটা অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস দিয়ে সুরক্ষিত। আরও ভেতরে চলে এলেন ডুগার্ড, থামলেন মেইন ডিসপ্লে রুমে। ইউরোপের বিখ্যাত ডিজাইনার এই কামরার প্ল্যান ও ডিজাইন তৈরি করেছেন। প্রধান রঙ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে নীল। কালেকশনের প্রতিটি আইটেম আলাদা কেসে রাখা হয়েছে।

মিডনাইট-ব্লু ভেলভেট কুশনে রাখা হয়েছে স্বর্ণালংকার আর মূল্যবান রত্ন, কামরার ভেতর এমন কোন জায়গা নেই যেখানে ওগুলো নেই। সুকৌশলে লুকানো স্পটলাইটের আলো এসে পড়েছে আইভরি আর অবসিডিয়ান-এর ওপর। প্রাচীন দেব-দেবীর অসংখ্য মূর্তি শোভা পাচ্ছে উঁচু মঞ্চের ওপর—থোথ, আনুবিস, হাপি আর সেথ আছেন, আছেন অসিরিস, আইসিস আর হোরাস।

কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে টাইটার স্টোন টেস্টামেন্ট। পাশে দাঁড়িয়ে ওটার মসৃণ গায়ে হাত বুলালেন ডুগার্ড, তারপর পাশের কামরায় চলে এলেন।

এখানে কাঠের জোড়া সেতুর ওপর রাখা হয়েছে ট্যানাস, লর্ড হারাব-এর কফিন। সাদা কোট পরা একজন রেডিওলজিস্ট আলোকিত ডিসপ্লে বোর্ডের সামনে ঝুঁকে রয়েছেন, বোর্ডে আটকানো রয়েছে কয়েকটা এক্স-রে প্লেট। পাশে এসে সেগুলোর দিকে তাকালেন ডুগার্ড। কাঠের কফিনের আউটলাইনের ভেতর কোঁকড়ানো মানুষের আকৃতি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা। 'এই বডি সম্পর্কে আমাকে আপনার কি বলার আছে?' মহিলা রেডিওলজিস্টের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডুগার্ড।

'পুরুষ,' বললেন মহিলা। 'মধ্যবয়স্ক, মৃত্যুর সময় বয়েস ছিল পঞ্চাশের ওপর, তবে ষাটের নিচে। ছোটখাট আকৃতি।' উপস্থিত সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে। 'পাঁচটা দাঁত নেই...'

একটানা পাঁচ মিনিট লাশের বর্ণনা দিলেন রেডিওলজিস্ট, তারপর বললেন, 'মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ বুক ভেদ করা জখম। জখমের জন্যে দায়ী হতে পারে বল্লম বা বর্শা। অস্ত্রটা কোনাকুনি ঢোকে, বাম ফুসফুস ফুটো করে ফেলে।'

'আর কিছু?'

'হের ডুগার্ড,' রেডিওলজিস্ট এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বললেন, 'আপনার আরও অনেক মমি পরীক্ষা করেছি আমি। কিন্তু এরকম আগে কখনও দেখিনি। ভিসারা বের করার জন্যে যেভাবে পেট কাটা হয়েছে, বোঝাই যায় অত্যন্ত দক্ষ কোন ফিজিশিয়ানের কাজ।'

'ধন্যবাদ,' বললেন ডুগার্ড, তাকালেন ফারুকীর দিকে। 'এ পর্যায়ে কোন মন্তব্য?'

'ট্যানাস, লর্ড হারাব-এর যে বর্ণনা সপ্তম স্ক্রোলে দেয়া হয়েছে তার সঙ্গে এ-সব মেলে না।'

'কোথায় মেলে না?'

'ট্যানাস ছিলেন দীর্ঘদেহী। বয়েস আরও কম। কফিনের ঢাকনিতে তাঁর ছবি দেখুন, হের ডুগার্ড।'

'বলে যান।'

এক্স-রে প্লেটের ডিসপ্লের সামনে এসে দাঁড়ালেন ফারুকী, হাত তুলে গাঢ় ও নিরেট কয়েকটা দাগের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 'জুয়েলারি,' বললেন তিনি। 'কবচ। বাজুবন্ধ। বুকের আচ্ছাদন বা বর্ম। কিছু নেকলেস। আঙটি আর কানের রিঙ। তবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলো মুকুটটা, মুকুটে বসানো গোক্ষুর সাপের ফণা। ওটা শুধু রাজপরিবারের সদস্যরা পরেন।'

'এ-সব কিসের ইঙ্গিত দেয়?' ডুগার্ডকে হতভম্ব দেখাল।

'এটা সাধারণ কোন মানুষের বডি নয়, কিংবা শুধু অভিজাত কারও বডিও নয়। অলংকারের পরিমাণ খুব বেশি। আমার বিশ্বাস এটা আসলে একটা রাজকীয় মমি।'

'অসম্ভব,' ধমক দিলেন ডুগার্ড। 'কফিনে কি লেখা রয়েছে পড়ুন। পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে এটা মিশরীয় একজন জেনারেলের মমি।'

'ক্ষমা করবেন, হের ডুগার্ড,' সবিনয়ে বললেন ফারুকী। 'সম্ভাব্য ব্যাখ্যা একটা নিশ্চয়ই আছে। রিভার গড বইটায় আভাস দেয়া হয়েছে টাইটা নাকি দুটো মমি অদলবদল করে–একটা ছিল ফারাও মামোসের মমি, অপরটা ছিল তার সুহৃদ ট্যানাসের।'

'অদলবদল করার কি কারণ ছিল?' ডুগার্ডের চেহারায় অবিশ্বাস।

'কুসংস্কার বা আধ্যাত্মিক কারণ থাকতে পারে, জাগতিক কোন কারণ যদি না-ও থাকে। টাইটা চেয়েছিল তার প্রিয় বন্ধু ট্যানাস ফারাও-এর গুপ্তধন মৃত্যুর পরও পাহারা দেবে এবং ব্যবহার করবে। বন্ধুর প্রতি এটা ছিল তার শেষ উপহার।'

'এ-সব আপনি বিশ্বাস করেন?'

'অন্তত অবিশ্বাস করি না। এই ধারণার পক্ষে আরও যুক্তি আছে, হের ডুগার্ড। এক্স-রে থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মমির তুলনায় কফিনটা আকারে অনেক বেশি বড়। আমার ধারণা, আরও দীর্ঘ কোন মানুষের জন্যে কফিনটা তৈরি করা হয়েছিল। জ্বী, হের ডুগার্ড, প্রচুর সম্ভাবনা আছে যে এটা একটা রাজবংশীয় মমি।'

ডুগার্ডের চেহারা পাঁশুটে দেখাচ্ছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, কথা বললেন কর্কশ সুরে, 'হোয়াট! কোন রাজার মমি?' ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে কফিনটার পাশে দাঁড়ালেন। 'খুলুন এটা। ফারাও মামোসের মমিটা আমাকে দেখান।'

সাত

কাজটা অত্যন্ত কঠিন। প্রথমে ফারুকীকে নিশ্চিত হতে হবে রঙের নিচে কোথায় রয়েছে ঢাকনির জয়েন্ট। সেটা জানার পরই কেবল বার্নিশ আর আঠা তোলার কাজে হাত দেয়া যাবে। কাজগুলো শেষ করতে প্রায় সারাটা দিন লাগিয়ে দিলেন তিনি।

ঢাকনি মুক্ত হবার পরও সেটা তোলা হলো না। হেস ডুগার্ড দুই ছেলের সঙ্গে মীটিঙে রয়েছেন, তাঁকে খবর পাঠানো হলো। জরুরী আলোচনা বাদ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভল্টে চলে এলেন তিনি, খুদে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে কফিনের দিকে তাকালেন। 'হ্যাঁ, তুলুন এবার ঢাকনি।'

ঢাকনি তোলা হলো। ভেতরে তাকালেন হেস ডুগার্ড। তাঁর চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল। ঐতিহ্যবাহী ভঙ্গিতে একটা লাশকে শুয়ে থাকতে দেখবেন বলে আশা করেছিলেন, তার বদলে কফিনের ভেতরটা এলোমেলো ও আলগা লিনেন ব্যান্ডেজে ভর্তি দেখতে পাচ্ছেন। 'এ-সব কি···' মনে হলো রেগে উঠবেন, ঝুঁকে বিবর্ণ ব্যান্ডেজ ধরতে গেলেন।

'না! ছোঁবেন না!' বাধা দিলেন ফারুকী। চিৎকার করা হয়ে গেছে, বুঝতে পেরে আড়ষ্টবোধ করলেন তিনি। 'মাফ করবেন, হের ডুগার্ড। ব্যাপারটা সত্যি বিস্ময়কর। লাশ অদলবদল হবার সম্ভাবনাটা আরও বেড়ে গেল। আপনার অনুমতি পেলে ব্যান্ডেজ খোলার আগে আরও স্টাডি করতে চাই, হের ডুগার্ড।'

মঞ্চ থেকে নেমে পড়লেন হেস ডুগার্ড। গাঢ় নীল ডাবল-ব্রেস্টেড জ্যাকেটের ব্রেস্ট পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছলেন মুখের। 'ঠিক আছে। কিন্তু এ কি সম্ভব? সত্যি এটা ফারাও মামোসের মমি হতে পারে?' আবার মুখ মুছলেন তিনি। 'আলগা বাঁধনগুলো খোলা হোক।'

'তার আগে, হের ডুগার্ড, ফটো তোলা দরকার–'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন ডুগার্ড। 'আমরা আর্কিওলজিস্ট, বিজ্ঞানী, সাধারণ লুটেরা নই। তুলুন ছবি।'

আলগা বাঁধনও খুব সাবধানে, একটু একটু করে খুলতে হচ্ছে। এত বেশি সময় লাগছে যে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ার অবস্থা হলো ডুগার্ডের। পুরানো আলগা কাপড়ের শেষটুকু মমির গা থেকে সরিয়ে নিলেন ফারুকী, সময় তখন রাত একটা। আলগা কাপড়ের পর নিখুঁতভাবে কয়েক স্তরে বাঁধা হয়েছে ব্যান্ডেজ, তবে সেগুলোর ফাঁক দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারছে চকচকে সোনা।

'রাজকীয় কফিনে, কফিনের ভেতর আরও কয়েকটা কফিন থাকার কথা। এখানে সে-সব দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে মা মুখোশগুলোও। ওগুলো নিশ্চয়ই

[illegible] মমি শুয়ে আছে, আবিষ্কারের অপেক্ষায়। এখানে আমরা শুধু রাজবংশীয় মমির ইনার ড্রেসিং দেখতে পাচ্ছি।'

লম্বা ফরসেপ দিয়ে ব্যান্ডেজের ওপরের স্তরটা ছাড়ালেন ফারুকী। ইতিমধ্যে আবার মঞ্চে দাঁড়িয়েছেন হেস ডুগার্ড, ঝুঁকে কফিনের ভেতর তাকিয়ে আছেন।

'এটা মামোস রাজপরিবারের বক্ষাবরণ বা বুকের বর্ম,' রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করলেন ফারুকী। স্পট লাইটের নিচে অলংকারটা ঝলমল করছে। বর্মটা সোনার তৈরি, বহুমূল্য রত্নখচিত, গোটা বুক জুড়ে আছে। মাঝখানে একটা শকুনের আকৃতি, সোনার ওপর, বিশাল ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে, বাঁকা নখে ধরে আছে রাজপরিবারের প্রতীক চিহ্ন, সোনার তৈরি সর্পিল অলংকরণ।

'আর কোন সন্দেহ নেই,' হেস ডুগার্ডও ফিসফিস করলেন। 'ওই প্রতীক চিহ্নই লাশের পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছে।'

এরপর ওঁরা রাজার হাত মুক্ত করলেন, বক্ষাবরণের ওপর ভাঁজ করা ছিল। আঙুলগুলো লম্বা, প্রতিটি আঙুলে একের পর এক আঙটি পরানো, হাতের মুঠোয় রাজদণ্ড। 'রাজার প্রতীক চিহ্ন। এটাই আসল প্রমাণ।' কথা বলার সময় হাঁপাচ্ছেন ফারুকী। 'উনি অষ্টম মামোস, প্রাচীন মিশরের আপার ও লোয়ার কিংডমের শাসনকর্তা।' রাজার মাথার দিকে এগোলেন তিনি, এখনও সেটা ব্যান্ডেজে মোড়া।

'না, মাথা খুলবেন সবশেষে,' বাধা দিলেন ডুগার্ড। 'ফারাও-এর মুখ দেখার জন্যে এখনও আমি প্রস্তুত নই।'

কাজেই রাজার শরীরের নিচের দিকটায় কাজ শুরু করলেন ফারুকী আর ফার্গুসন। ব্যান্ডেজের প্রতিটি স্তরের নিচ থেকে বেরুল মন্ত্রঃপূত কবচ, সবই সোনার তৈরি, বহুমূল্য রত্নখচিত। আকাশ, জমিন আর পানিতে এমন কোন প্রাণী নেই যার নকশা খোদাই করা হয়নি কবচগুলোয়, সবই রঙিন। প্রতিটি কবচের ফটো তোলা হলো, তারপর কফিন থেকে তুলে রাখা হলো রূপোর ট্রেতে।

'অনেক রাত হয়েছে, হের ডুগার্ড,' এক সময় বললেন ফারুকী। 'আপনি যদি বিশ্রাম নিতে চান...'

'না!'

এরপর রাজার আঙুল থেকে আঙটিগুলো খোলা হলো এক এক করে। সবশেষে ফারুকী আর ফার্গুসন এসে দাঁড়ালেন মাথার দু'পাশে। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে ফারাও-এর মুখ আর মাথা, প্রায় চার হাজার বছর পর এই প্রথম। চুল খুব পাতলা, হেনা দিয়ে রাঙানো। চামড়ায় সুগন্ধী লাক্ষার প্রলেপ দেয়া হয়েছিল, পালিশ করা অ্যাম্বারের মত শক্ত হয়ে গেছে। নাকটা বড়, টিকালো। ঠোঁট জোড়া পিছন দিকে সামান্য ঢুকে আছে, যেন স্বপ্নের ভেতর হাসছেন। চোখের পাতায় রেজিন বা লাক্ষার প্রলেপ থাকায় অশ্রুতে ভেজা মনে হলো, পাতাগুলো আধবোজা। ফারাও তাঁর কপালে রাজকীয় মুকুট পরে আছেন। গোক্ষুরের মাথার প্রতিটি বৈশিষ্ট্য এখনও নিখুঁত ও স্পষ্ট। লম্বা জিভ মাঝখানে চেরা। চোখগুলো চকচকে নীল কাঁচ। ফণার পিছনে রাজপরিবারের প্রতীক চিহ্ন।

'ওই মুকুট আমার চাই,' আবেগে কেঁপে গেল ডুগার্ডের কণ্ঠস্বর। 'তুলুন ওটা, আমার হাতে দিন।'

'কিন্তু তুলতে গেলে মমির ক্ষতি হতে পারে...'

ফারুকীকে ধমক দিলেন ডুগার্ড। 'আবার তর্ক করেন!'

'এখুনি তুলছি, হের ডুগার্ড,' তাড়াতাড়ি বললেন ফারুকী। 'তবে সময় লাগবে। হের ডুগার্ড যদি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন, তোলার পর আমরা খবর পাঠাব...'

রেজিন মোড়া কপালের চামড়ার সঙ্গে সোনার বৃত্তটা শক্তভাবে আটকে আছে। কপাল থেকে ওটাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে কফিন থেকে গোটা মমিটা তুলতে হলো প্রথমে। তোলার পর স্টেইনলেস স্টীলের স্ট্রেচারে শোয়ানো হলো। বিশেষভাবে তৈরি সলভেন্টের সাহায্যে নরম করা হলো রেজিন। কাজটা শেষ করতে প্রচুর সময় লাগল।

মুকুটটা আলাদা করে রাখা হলো নীল ভেলভেট কুশনে। ভল্টের সমস্ত আলো নিস্তেজ করে দিয়ে একটা মাত্র স্পট লাইটের আলো সরাসরি ফেলা হলো ওটার ওপর। তারপর ফারুকী আর ফার্গুসন ওপরতলায় গেল ডুগার্ডকে খবর দিতে।

মুকুট দেখার জন্যে ভল্টে যখন আবার নামলেন ডুগার্ড, সঙ্গে ওদের কাউকে রাখলেন না, ওদের বদলে পাশে থাকলেন প্রাইভেট সেক্রেটারি ক্যান্ডি ক্যাম্পবেল।

মুকুটটা দেখামাত্র হাঁপাতে শুরু করলেন তিনি, হেলান দিলেন মহিলার গায়ে। মহিলা, ক্যাম্পবেল, জড়িয়ে ধরে রাখলেন ডুগার্ডকে। কোন কথা হলো না। নিজে থেকেই ধীরে ধীরে বসকে বিবস্ত্র করলেন তিনি। তারপর নিজেও বিবস্ত্র হলেন।

এক পর্যায়ে নগ্ন মহিলাকে কফিনের ভেতর শুইয়ে দিলেন ডুগার্ড। কেউ কোন কথা বলছেন না, সব যেন আগে থেকে ঠিক করা আছে। এরপর তিনি নিজেও ঢুকলেন কফিনে।

দশদিন পর কায়রো থেকে লন্ডনে ফিরল নিমা। রাত বারোটার ফ্লাইটে। এয়ারপোর্টে রানা ওকে নিতে এসেছে।

মাত্র দশদিনের ব্যবধান, অথচ নিমার মনে হলো কত যুগ পরে আবার রানাকে দেখছে ও। ওকে আবার কাছে পেয়ে রানার আনন্দ-উচ্ছ্বাসও দেখার মত হলো। 'আপনার হাঁটুর খবর কি?' প্রথমেই জানতে চাইল রানা। 'এখনও কি পিঠে তুলে নেয়ার প্রয়োজন আছে?'

'প্রায় সেরে গেছে,' হাসতে হাসতে জবাব দিল নিমা। 'লাঠিটা এবার ফেলে দিলেই পারি।'

রেঞ্জ রোভারে চড়ে রানার অফিস-কাম-ফ্ল্যাটে ফিরছে ওরা। রানা জানতে চাইল, 'কি ঘটল কায়রোয়? কি করলেন, কোথায় গেলেন?'

'পরে বলব,' ম্লান সুরে জবাব দিল নিমা। একটু চিন্তিত হলো রানা, তবে আর কোন প্রশ্ন করল না।

ফ্ল্যাটে পৌঁছে নিমার ব্যাগ নিয়ে করিডর ধরে এগোচ্ছে রানা, পাশের একটা

কামরা থেকে নাক ডাকার আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়াল নিমা। 'কে ওখানে?'

'টনি মারটিন,' বলল রানা। 'টীমের নতুন সদস্য। আমাদের নিজস্ব এঞ্জিনিয়ার। কাল আপনার সঙ্গে পরিচয় হবে।' দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, ওর পিছনে এসে দাঁড়াতে হলো নিমাকেও।

হঠাৎ নিমার নাকে রানার গন্ধ লাগল, এবং চোখের পলকে অ্যাবি গিরিখাদে ফিরে গেল ও। রানার মেদহীন একহারা কাঠামো, ঘামে ভেজা, খাড়া ট্রেইল ধরে উঠে যাচ্ছে, পিঠে ঝুলে রয়েছে ও। সেই স্পর্শে কোন লোভ-লালসা ছিল না, ছিল আশ্বাস আর নিরাপত্তা, ত্যাগ আর যত্ন-আত্তি, সহানুভূতি আর দরদ। নিজেকে খুব ছোট মনে হলো নিমার, নিজের জীবন বিপন্ন করে রানা ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে অথচ মন খুলে এখনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়নি।

তারপর ভাবল, শুধু মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করায় তৃপ্তি নেই। অথচ কিছু দিয়ে রানাকে সন্তুষ্ট করাও সম্ভব নয়। দেয়ার মত কি আছে ওর?

ব্যাগগুলো ওর কামরায় পৌঁছে দিয়ে নিজের কামরায় ফিরে এল রানা।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে নিমার সঙ্গে টনি মারটিনের পরিচয় করিয়ে দিল ও। মারটিন নিগ্রো, বয়স পঁয়ত্রিশের মত, দেখতে নাদুসনুদুস। নিমাকে সে বলল, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস আল নিমা।'

'ড. আলি নিমা,' সংশোধন করে দিল রানা।

মাথা নাড়ল নিমা। 'না, আমাকে শুধু নিমা বলে ডাকবেন, প্লীজ।'

ব্রেকফাস্টে বসে ইথিওপিয়া বা টাইটা প্রসঙ্গে কোন আলোচনা হলো না, মারটিন আর রানা নিজেদের অতীত স্মরণ করে খানিকক্ষণ হাসাহাসি করল। তারপর হাতে কফির কাপ নিয়ে দাঁড়াল রানা, 'আসুন,' নিমাকে বলল। 'আপনাকে একটা জিনিস দেখাই।'

ওর পিছু নিয়ে সিটিংরূমের সামনে এসে দাঁড়াল নিমা আর মারটিন। কামরাটার দরজা খুলে নাটকীয় ভঙ্গিতে কুর্নিশ করল রানা, বলল, 'দয়া করে ভেতরে ঢুকুন!'

সেন্ট্রাল টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে জলজ্যান্ত ডোরাকাটা ডিক-ডিক, শিং সহ। আফ্রিকা থেকে আনা ছালটা কিছু দিয়ে ভরা হয়েছে, জায়গামত বসানো হয়েছে শিং দুটো–ব্যস, তৈরি হয়ে গেছে নিখুঁত মডেল। নিমার মনে হলো, এখুনি ওটা লাফ দেবে। 'ওহ, রানা, কি সুন্দর!' ডিক-ডিককে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে ও।

মডেলটা সব কথা মনে করিয়ে দিল নিমাকে। গিরিখাদের ঝোপের ভেতর প্রচণ্ড গরম, খাদ থেকে নিচে পড়ে যাবার ভয়, ডানডেরা নদী, টাইটার পুল, প্রক্সির হেলিকপ্টার, মঠ, সন্ন্যাসী, আর বাটির মর্মান্তিক মৃত্যু, সব যেন একসঙ্গে ভিড় করে এল মনের কানাচে। অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা গ্রাস করল ওকে। সেটা বুঝতে পেরে ওর একটা হাত ধরে টান দিল রানা, ফিরিয়ে আনল ডাইনিং রূমে।

'ডানডেরা নদীর গহ্বরে কিভাবে নামব, আসুন আলোচনা করি,' বলল রানা। 'আপনি ছিলেন না, মারটিন আর আমি একটা প্ল্যান তৈরি করেছি। আপনার মনে আছে তো, টাইটার পুলে ডুব দেয়ার জন্যে স্কুবা ব্যবহার করার কথা ভেবেছিলাম আমরা? কি কি সমস্যা আছে তা-ও বলেছিলাম।'

'হ্যাঁ, মনে আছে,' বলল নিমা। 'আপনি বলেছিলেন অ্যান্ডারওয়াটার ফাটলের কাছে প্রেশার খুব বেশি, কাজেই অন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।'

'হ্যাঁ। সেই অন্য পদ্ধতির কথা আমাকে জানিয়েছেন মারটিন। বলা যায়, সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেছে।'

মারটিনের দিকে তাকাল নিমা। মারটিন একবার কেশে গলা পরিষ্কার করল, তারপর বলল, 'একটু আভাস দিই। মাঝে মধ্যে পুরানো পদ্ধতিই সবচেয়ে ভাল কাজ দেয়।'

ওকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা হচ্ছে, বুঝতে পেরে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিল নিমা। 'আপনার যদি এতই বুদ্ধি, তাহলে বিখ্যাত নন কেন?' প্রশ্নটা করার পর হঠাৎ ভুরু কোঁচকাল। 'পুরানো পদ্ধতি? তারমানে টাইটা যেভাবে কাজটা করেছিল? ডাইভিং ইকুইপমেন্ট ছাড়া যেভাবে সে পুলের তলায় পৌঁচেছিল?'

'কি সাংঘাতিক! উনি তো ধরে ফেলেছেন! রানা, কে কাকে সারপ্রাইজ দিচ্ছে?' অসহায় দেখাল মারটিনকে।

একবার তালি মারল নিমা। 'বাঁধ!' বলল ও। 'চার হাজার বছর আগে টাইটা যেখানে বাঁধ দিয়েছিল আপনারাও সেখানে আবার বাঁধ দিতে চাইছেন!'

টেবিল ছেড়ে দেয়ালের পাশে এসে দাঁড়াল মারটিন, দেয়াল ঘেঁষে খাড়া করা পর্দা ঢাকা একটা বোর্ড রয়েছে ওখানে। পর্দাটা সরাল সে, উন্মোচিত হলো পিন দিয়ে আটকানো এনলার্জ করা ফটোগুলো। ডানডেরা নদীর যেখানে টাইটা বাঁধ তৈরি করেছিল বলে ধারণা করে ওরা, রানার তোলা সেই জায়গার ফটো রয়েছে এখানে। আর রয়েছে বাটির দেখানো প্রাচীন কোয়ারির ফটো। ওগুলোর ওপর মার্কার পেন দিয়ে রেখা টানা হয়েছে, দূরত্বের হিসাব লেখাও হয়েছে।

'রানা আমাকে এই পয়েন্টে রিভার বেড-এর ডাইমেনশন-এর হিসাব দিয়েছে, আগের প্রবাহ ফিরে পেতে হলে কতটা উঁচু করতে হবে পাঁচিল, তারও আনুমানিক একটা হিসাব আমরা বের করেছি। সঙ্গে খুব কম ইকুইপমেন্ট থাকবে, তবু কাজটা করা সম্ভব বলে মনে করি আমি।'

'প্রাচীন মিশরীয়রা যদি করতে পারে, আপনার জন্যে কাজটা পানির মত সহজ হবার কথা, মারটিন,' মন্তব্য করল নিমা।

'ধন্যবাদ, নিমা,' আড়ষ্ট হেসে বলল মারটিন। 'তবে কাজটা সহজ নয় মোটেই।' বোর্ডে আটকানো ড্রইংগুলোর দিকে তাকাল সে। 'বাঁধ তৈরি করার অনেক পদ্ধতি আছে, তবে আজকাল যে পদ্ধতিতে তৈরি করা হয় তাতে হাতের কাছে রিইনফোর্সড কংক্রিট আর হেভি আর্থ-মুভিং ইকুইপমেন্ট দরকার। এ-সব আধুনিক সুবিধে আমরা পাব বলে মনে হয় না।'

'টাইটা তো বুলডোজারের সাহায্য ছাড়াই কাজটা করেছিল।'

'কিন্তু তার ছিল বিপুল লোকবল।'

'লোকবল কমবেশি আমরাও যোগাড় করতে পারব।'

রানা বলল, 'বর্ষা শুরুর আগে আমাদের হাতে সময় মাত্র দু'মাস। ভাবছি মঠ সন্ন্যাসীদের সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা।'

'তোমরা আমাকে শ্রমিক এনে দেবে, আমি তোমাদেরকে বাঁধ তৈরি করে

দেব,' প্রতিশ্রুতি দিল মারটিন। 'আগে যেমন বলেছি, পুরানো পদ্ধতিই ভাল। প্রাচীন মিশরীয়রা মূল বাঁধের ভিত তৈরির জন্যে যে কফার ড্যাম আর গ্যাবিয়ন সিস্টেম ব্যবহার করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'সরি,' বাধা দিল নিমা। 'গ্যাবিয়ন? এঞ্জিনিয়ারিঙে আমার কোন ডিগ্রী নেই।'

'সরি বলা উচিত আমার,' আড়ষ্ট হেসে বলল মারটিন। 'আমার ড্রইংগুলো দেখুন, প্লীজ।' বোর্ডের দিকে ফিরল সে। 'এই টাইটা ভদ্রলোক সম্ভবত বাঁশ বা বেত দিয়ে বিশাল আকারের ঝুড়ি তৈরি করে সেগুলোয় পাথর ভরেছিলেন। এগুলোকে গ্যাবিয়ন বলে।' বোর্ডের আঁকা নকশা দেখাল সে। 'তারপর গ্যাবিয়নগুলোর মাঝখানে বৃত্তাকার পাঁচিল তোলার জন্যে কাঠ ব্যবহার করেন। সেগুলোও তিনি পাথর আর মাটি দিয়ে ভরাট করেন।'

'মোটামুটি একটা ধারণা পাচ্ছি,' বলল নিমা। 'তবে এত সব খুঁটিনাটি আমার না জানলেও চলে।'

'তা ঠিক,' বলল মারটিন। 'রানা আমাকে জানিয়েছে, কাঠের কোন অভাব হবে না। তবে বাঁশ বা বেতের বদলে ব্যবহার করব তারের জাল, গ্যাবিয়ন তৈরির কাজে।'

'তারের জাল?' নিমা অবাক। 'অ্যাবি উপত্যকায় আপনি তারের জাল পাবেন কোত্থেকে?'

'কাছাকাছি একটা এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে তৈরি হচ্ছে ওগুলো,' বলল মারটিন। 'অন্যান্য ইকুইপমেন্টেরও অর্ডার দেয়া হয়েছে।'

'কোয়ারির কথাটাও বলো,' উৎসাহ যোগাল রানা।

মাথা ঝাঁকাল মারটিন। 'কোয়ারির ফটো দেখেছি আমি। দেড়শোর বেশি গ্র্যানিট ব্লক সাইজ করা আছে। তারের জাল আর টিম্বার কফার ওয়াল-এর সঙ্গে যদি এই ব্লকগুলো ব্যবহার করি, মূল বাঁধের ভিত খুব শক্ত হবে।'

'একেকটা ব্লক কত টন ওজন, আন্দাজ করতে পারেন? আনবেন কিভাবে?' প্রশ্ন করার পর হাত তুলল নিমা। 'থাক, বলতে হবে না। আপনি সম্ভব বললে আমি মেনে নেব।'

'সম্ভব,' আশ্বস্ত করল মারটিন।

'টাইটা যখন আনতে পেরেছে, আমরাও পারব,' বলল রানা। 'তার পদ্ধতিই ব্যবহার করব আমরা। আপনার এতে খুশি হবার কথা। হাজার হোক, সে আপনার আত্মীয়।'

'ঠাট্টা নয়, আত্মীয়ই তো।'

'সমস্ত ইকুইপমেন্ট কাল থেকে লোড করার কাজ শুরু হবে,' বলল রানা। 'আপনাকে বলা হয়নি, আমরা মাল্টায় যাচ্ছি।'

'মাল্টায় কেন?'

'আমার বন্ধুর স্ত্রী সেলিনা নাসিম জানিয়েছেন, হাতে প্লেন না থাকায় সাহায্য করতে পারছেন না,' বলল রানা। 'তবে আফ্রিকান স্কাই নামে একটা চার্টার কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন আমার। দুই বাপ-ব্যাটা চালায় ওটা, ইস্কান্দর আর কালান্দার। মাল্টা ওদের বেস। ওদের সম্পর্কে আগে থেকেই

জানি আমি। ওদের হারকিউলিস প্লেন আছে। অ্যাবে গিরিখাদে ওরাই আমাদেরকে নিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে যে-সব ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে সবই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে মাল্টায়। বাকি সব নিয়ে দু'তিন দিনের মধ্যে রওনা হয়ে যাবে মারটিন। আমরা যাব এক হপ্তা পর।'

'ইথিওপিয়া থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে আমাদের,' বলল নিমা। 'ফিরব কিভাবে?'

'খিড়কি দরজা দিয়ে।' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'গেট কীপার হিসেবে থাকবে পুরানো দোস্ত শাফি।'

'শাফির সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করেছেন?'

'রুবির মাধ্যমে। মনে হলো রুবিই এখন শাফির প্রাইভেট সেক্রেটারি। বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে শাফি, কারণ বিশাল পরিধি জুড়ে রুবির যোগাযোগ, শাফির দূত হিসেবে আফ্রিকার যে-কোন শহরে যেতে পারবে ও, যে-সব জায়গায় যাওয়া শাফির জন্যে নিরাপদ নয়।'

'দেখা যাচ্ছে অনেক কাজই সেরে ফেলেছেন আপনি,' বলল নিমা। 'শাফি কি টাইটার ব্যাপারটা জানেন?'

'বিশদ জানে না।' মাথা নাড়ল রানা। 'তবে সন্দেহ করেছে। কিছু আসে যায় না, আমি তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি।'

'ওদিকের আর সব খবর কি?'

'ফোনে কথা বলার সময় রুবিকে খুব উত্তেজিত মনে হলো,' বলল রানা। 'পরিষ্কার কিছু বলতে পারল না, তবে শুনেছে সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াস মঠে নাকি হামলা করা হয়েছে। ওলি জারকাস সহ চল্লিশ জনের মত সন্ন্যাসী হতাহত হয়েছেন। চার্চে যে-সব পবিত্র পুরানিদর্শন ছিল সবই নাকি লুঠ হয়ে গেছে।'

'ওহ্, ডিয়ার গড, নো!' স্তম্ভিত দেখাল নিমাকে। 'এ কিভাবে সম্ভব! কারা করল?'

'হাসলানকে যারা খুন করেছে,' বলল রানা। 'আর আপনাকে খুন করার জন্যে তিনবার চেষ্টা করেছে।'

'প্রক্সি।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'হেস ডুগার্ড।'

দৈত্যাকার হারকিউলিস সি এমকে ওয়ান চার এঞ্জিন বিশিষ্ট টারবোপ্রপ প্লেন, গায়ের রঙ ধূসর খয়েরি, ফিউজিলাজের আইডেনটিফিকেশন লেটারিং ঝাপসা হয়ে গেছে। প্লেনের কোথাও আফ্রিকান স্কাই লেখা নেই। ইস্কান্দারের হাতে পড়ার আগে চল্লিশ বছরে পাঁচ লাখ ঘণ্টা উড়েছে ওটা।

মাল্টার ভ্যালেটা এয়ারফিল্ডের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা প্লেনটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে নিমা। 'উড়বে তো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ইস্কান্দার ইচ্ছে করেই ওটার চেহারা এরকম করুণ করে রেখেছেন,' ওকে আশ্বস্ত করল রানা। 'চুপিচুপি বলি, এই প্লেন স্মাগলিং-এর কাজে ব্যবহার করা হয়।'

'পাইলট হিসেবে কেমন ওঁরা?'

'দু'জনেই, মানে বাপ ও ব্যাটা, ফার্স্ট-রেট অ্যারো-এঞ্জিনিয়ার।'

হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এলেন ইস্কান্দার গাউস, হাতছানি দিয়ে ডাকলেন ওদের। তাঁর পিছু নিয়ে বিশাল হ্যাঙ্গারে ঢুকল ওরা, থামল ছোট একটা অফিসের সামনে, দরজায় লেখা রয়েছে আফ্রিকান স্কাই। ভেতরে সুন্দরী একটা মেয়ে বসে রয়েছে।

'ইস্কান্দারের নতুন সেক্রেটারি,' ফিসফিস করল রানা। 'শুনেছি ছেলের বউ করবে। ওর নাম ফাতেমা।'

'আপনি তো আমার সঙ্গে লন্ডন থেকে আসছেন, এত কথা জানলেন কিভাবে?'

'আগেই জেনেছি,' বলল রানা। 'বেশিরভাগ নাসিমের কাছ থেকে।'

ফাতেমা ওদেরকে কফি পরিবেশন করল। ইস্কান্দারের সঙ্গে ফ্লাইট প্ল্যান নিয়ে কথা হলো রানার।

'জ্ঞাতি ভাই গাদ্দাফীর সঙ্গে এই মুহূর্তে আমার একটু মন কষাকষি চলছে, তাই তাঁর রাজ্য এড়িয়ে প্লেন চালাতে হবে আমাকে। মিশরের ওপর দিয়ে যাব, তবে ল্যান্ড করব না।' হাত তুলে ডেস্কে ছড়ানো ম্যাপগুলো দেখালেন তিনি। 'সুদানে আবার গৃহযুদ্ধ চলছে, তবে উত্তর দিকটায় রাডার ব্যবস্থা আধুনিক নয়, তাই ব্ল্যাঙ্ক স্পট দেখে উড়ে যাওয়া কঠিন হবে না। সামরিক স্থাপনাগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকব আমরা। ল্যান্ড করব সীমান্তের বেশ খানিক এদিকে।'

'ফ্লাইং ট্যাইম সম্পর্কে একটা ধারণা দিন,' বলল রানা।

'পনেরো ঘণ্টা।'

'রিফুয়েলিং?'

'দরকার হবে না। এক্সট্রা ট্যাংক আছে। একাত্তর হাজার কিলো ফুয়েল নিচ্ছি।' হ্যাঙ্গারের গেট দিয়ে বড় একটা ট্রাক ঢুকল। 'কালান্দার আর মারটিন ফিরে এসেছে।'

ট্রাকটা থামল হ্যাঙ্গারের শেষ মাথায়, ওখানে ইকুইপমেন্ট ও স্টোর স্তূপ হয়ে রয়েছে, লোড করার জন্যে তৈরি। ট্রাক থেকে নেমে এল কালান্দার, রানা ও নিমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। ছেলেটা বাপেরই তরুণ সংস্করণ।

'এটাই শেষ ট্রাক,' ট্রাকের সামনের দিকটা ঘুরে এগিয়ে এল মারটিন। 'আর কোন কার্গো নেই। ইচ্ছে করলে এখুনি আমরা প্লেনে ওগুলো তুলে ফেলতে পারি। আমার ফ্রন্ট-এন্ড লোডিং ট্র্যাক্টর একদম শেষে তুলব।'

'ভোর চারটের সময় রওনা হতে চাই আমরা,' বলল রানা। 'সব কার্গো একসঙ্গে নেয়া যাচ্ছে না, হারকিউলিসকে আরও একবার কার্গো নিয়ে যেতে হবে।'

ইস্কান্দার বললেন, 'নো প্রবলেম।'

'টাইটা, আসছি আমরা!' নিমার ফিসফিসানি একা শুধু রানা শুনতে পেল।

'প্রক্সি, তোমরাও তৈরি থাকো,' বিড়বিড় করল রানা, একা শুধু নিমা শুনতে পেল কথাটা।

*

'ওরা আবার ইথিওপিয়ায় ফিরে যাচ্ছে,' গম্ভীর সুরে বললেন হেস ডুগার্ড।

'আচ্ছা! আপনি ঠিক জানেন, হের ডুগার্ড?'

ফারুকীর দিকে কটমট করে তাকালেন ডুগার্ড। এই মিশরীয় আর্কিওলজি এক্সপার্ট তাঁর বিরক্তি উৎপাদনের কারখানায় পরিণত হয়েছেন। ভদ্রলোককে চাকরি দেয়ায় নিজের ওপর এখন তিনি অসন্তুষ্ট। নিজের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা ঝাড়লেও, মঠ থেকে উদ্ধার করে আনা ফলকটার খোদাই অনুবাদ করতে মোটেও সফল হননি ফারুকী। কেন দেরি হচ্ছে জিজ্ঞেস করায় একের পর এক খোঁড়া অজুহাত খাড়া করছেন। 'আপনি কি ভাবেন, প্রতিপক্ষ কি করছে না করছে আমি তার খবর রাখব না? জেনারেল উর্মিদ মানামা ওদের ওপর নজর রাখছেন, তাঁর কাছ থেকে সব খবর পাচ্ছি আমি। ইংল্যান্ড থেকে আল নিমা মিশরে গিয়েছিলেন...'

'সেক্ষেত্রে, হের ডুগার্ড, তার ব্যবস্থা করেননি কেন?'

'আপনি গাধা নাকি?' রেগে গেলেন ডুগার্ড। 'ব্যবস্থা করিনি, কারণ আমার ধারণা আপনি নন, আল নিমাই আমাকে ফারাও-এর সমাধিতে নিয়ে যাবে।'

'কিন্তু, স্যার, আমি তো...'

'এখন পর্যন্ত কিছুই আপনি করেননি, ফারুকী। ফলকটা এখনও দুর্বোধ্য...'

'কাজটা খুব কঠিন, হের ডুগার্ড।'

'কঠিন বলেই তো মোটা টাকা বেতন দিয়ে আনা হয়েছে আপনাকে। ওই ফলকে সত্যি যদি মামোসের সমাধিতে পৌঁছুনোর সূত্র থাকে, তাহলে লেখক টাইটা সেটাকে জটিল করেই তো রাখবে।'

'আমাকে যদি আরও খানিক সময় দেয়া হয়...'

'কি বলছি শুনতে পাচ্ছেন না? মাসুদ রানা অ্যাবে গিরিখাদে ফিরে যাচ্ছেন। মাল্টা থেকে একটা চার্টার করা প্লেন নিয়ে রওনা হয়ে গেছেন তাঁরা, সঙ্গে সমস্ত ইকুইপমেন্ট আছে, ট্র্যাক্টর সহ। আমার কাছে এর অর্থ হলো, তাঁরা সমাধিটা খুঁজে পেয়েছেন, ফিরে যাচ্ছেন মাটি খুঁড়ে বের করতে।'

'ওরা মঠে পৌঁছাক না, খতম করা কোন ব্যাপার না,' বললেন ফারুকী, যেন নিজেই আশ্বস্ত হতে চাইছেন। 'কর্নেল ঘুমাকে বললেই তিনি ব্যবস্থা করবেন।'

'আপনি একটা উজবুক!' গর্জে উঠলেন ডুগার্ড। 'যারা আমাকে মামোসের সমাধি পাইয়ে দেবেন, আমি তাঁদেরকে মেরে ফেলব?' ফারুকীর দিকে চোখ গরম করে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। 'আপনাকে আমি ইথিওপিয়ায় ফেরত পাঠাচ্ছি। ওখানে কোন কাজে এলেও আসতে পারেন।'

ফারুকী চুপ করে থাকলেন।

'বেস ক্যাম্পে গিয়ে রাফেলের অধীনে কাজ করবেন আপনি,' বললেন ডুগার্ড। 'সে আপনাকে অর্ডার করবে, আপনি তার অর্ডার মত কাজ করবেন। মাসুদ রানা বা আল নিমার বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নিতে যাবেন না।'

'ওখানে তাহলে আমার কাজটা কি হবে?'

'অ্যাকশন নেবেন না, তবে ওদের ওপর নজর রাখবেন। কিন্তু সাবধান, নজর

রাখতে গিয়ে ওদেরকে আবার সতর্ক করে দেবেন না যেন। কর্নেল ঘুমার একজন স্পাই আছে, ওদের গতিবিধি সম্পর্কে সে কর্নেলকে রিপোর্ট করবে, আপনি কর্নেলের কাছ থেকে সে-সব জেনে নিয়ে বিশ্লেষণ করবেন, বুঝতে চেষ্টা করবেন মাসুদ রানা ঠিক কি অর্জন করতে চাইছেন।'

'আর আপনি? ইথিওপিয়ায় আসছেন না?'

'এত প্রশ্ন করেন কেন? সময় হলে ঠিকই আমি ওখানে পৌঁছে যাব।'

'ফলকটার কি হবে?'

'আপনি ওটার ফটো তুলে নিয়ে যান। স্যাটেলাইটে রিপোর্ট পাঠাবেন।'

'আমাকে কখন আপনি পাঠাতে চান?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সম্ভব হলে এখুনি। আমার সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলুন, যান।'

পনেরো ঘণ্টার ফ্লাইট শেষ হয়ে এল। পুব দিগন্তে ইথিওপিয়ান পাহাড়-শ্রেণীর নীলচে আভাস ফুটে উঠল গাঢ় নীল আফ্রিকান আকাশের গায়ে, হাত তুলে রানা না দেখানো পর্যন্ত নিমার চোখে ধরা পড়ল না। 'প্রায় পৌঁছে গেছি,' বলল ও। 'চলুন, ফ্লাইট ডেকে যাই।'

উইন্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে সামনে কোথাও ল্যান্ডমার্ক দেখল না ওরা, যতদূর দৃষ্টি যায় ধু-ধু বৃক্ষহীন প্রান্তরই শুধু চোখে পড়ে।

'আমার হিসেবে দশ মিনিটে পৌঁছে যাব আমরা,' বললেন ইস্কান্দার। 'কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছেন?' উত্তরে কেউ কিছু বলল না।

পাঁচ মিনিট।

'ওদিকে!' ইস্কান্দারের কাঁধের ওপর দিয়ে হাত লম্বা করে দেখাল রানা। 'ওটাই নীলনদের কোর্স।' বহু দূর সামনে ঘন কাঁটাঝোপ গাঢ় একটা রেখা তৈরি করেছে। 'সুগার মিলের চিমনিটাও দেখা যাচ্ছে। শাফি বলেছে মিল থেকে তিন মাইল দূরে এয়ারস্ট্রিপটা।'

'কিন্তু চার্টে নেই,' বললেন ইস্কান্দার। 'কোঅর্ডিনেটস-এ পৌঁছুতে আর এক মিনিট।' স্পওয়াচে ধীরে ধীরে পার হলো সময়টা।

'এখনও কিছু দেখছি না,' কো-পাইলটের সীট থেকে বলল কালান্দার। তার কথা শেষ হওয়া মাত্র হারকিউলিসের নাকের সামনে দিয়ে একটা ফ্লেয়ার উঠে গেল আকাশের আরও ওপরে। ককপিটে উপস্থিত সবাই স্বস্তির হাসি হাসল।

ইস্কান্দারের পিঠ চাপড়ে দিল রানা। 'ধন্যবাদ। এতটা সরাসরি আমি নিজেও পৌঁছুতে পারতাম না।'

কয়েকশো ফুট ওপরে উঠল প্লেন, ওয়ান-এইটি টার্ন নিয়ে ফিরে আসছে। প্রান্তরে এখন দুটো সিগন্যাল ফ্লেয়ার জ্বলছে—একটা কালো ধোঁয়া ছাড়ছে, অপরটা সাদা। মাইলখানেক দূরে থাকতে ঝোপে ঢাকা ও পরিত্যক্ত ল্যান্ডিং স্ট্রিপের অস্পষ্ট রেখা ধরা পড়ল চোখে। বিশ বছর আগে রোজিরেস এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করেছিল একটা বেসরকারী কোম্পানী। নীলনদ থেকে পানি নিয়ে আখ চাষ করার পরিকল্পনা ছিল তাদের। কিন্তু বরাবরের মত আফ্রিকান খরা জিতে যায়, পাততাড়ি

গুটিয়ে বিদায় নেয় কোম্পানী। সেই থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে এয়ারস্ট্রিপটা। অ্যালান শাফি রঁদেভোঁ হিসেবে এই জায়গাটা বেছে নিয়েছে।

'কাউকেই তো দেখছি না,' বললেন ইস্কান্দার। 'আমাকে এখন কি করতে বলেন?'

'আরেকটা ফ্লেয়ার থাকার কথা···ওই তো!' রানওয়ের শেষ প্রান্ত থেকে আকাশে উঠল আরেকটা ফ্লেয়ার। হাসছে রানা। কাঁটাঝোপের আশপাশে এই প্রথম মানুষের নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে। একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়েছিল ওরা।

'শাফি, সন্দেহ নেই। আপনি ল্যান্ড করতে পারেন।'

ওদের সামনে রানওয়েতে এখন ক্যামোফ্লেজ ফেটিগ পরা সচল মূর্তি দেখা যাচ্ছে।

প্লেন থামার পর লোডিং র‍্যাম্প নিচু করা হলো, সেটা বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে এল শাফি। 'রানা!' আলিঙ্গন করল রানাকে, সশব্দে চুমো খেলো দু'গালে, আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা। 'আমার কথাই ঠিক! শুধুই ডিক-ডিক শিকার নয়, অন্য কোন রহস্য আছে! কি?'

'পুরানো বন্ধুকে মিথ্যে বলি কিভাবে!' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'তাহলে কি ধরে নিতে পারি দু'জন মিলে খুব মজা করা যাবে? জীবন এখানে বড়ই একঘেয়ে।'

'কথা দিচ্ছি।'

একহারা দেহ সৌষ্ঠব, একটা নারীমূর্তি উঠে এল র‍্যাম্প বেয়ে। মেয়েটার পরনে জলপাই-সবুজ ফেটিগ। কথা না বলা পর্যন্ত রুবিকে রানা চিনতেই পারল না। ক্যানভাস প্যারা বুট আর কাপড়ের তৈরি ক্যাপ্ পরে আছে, দেখে মনে হবে একটা ছেলে।

'স্যার, মি. রানা! ম্যাডাম, ড. নিমা! ওয়েলকাম ব্যাক!' চিৎকার জুড়ে দিল রুবি, হাঁপাচ্ছে। নিমা আর রুবি জোড়া লেগে গেল।

'এটা অস্বস্তিকর একটা সমস্যা,' বলল রানা। 'বারণ করলেও শোনে না।'

সবাই চুপ করে গেল, তাকিয়ে আছে ওর দিকে। 'রুবিকে বলছি,' আবার বলল রানা। 'একশোবার বারণ করেছি, আমাকে স্যার বলা যাবে না, নিমাকেও ম্যাডাম বলার দরকার নেই। কেন, মাসুদ ভাই আর নিমা আপা বলতে অসুবিধে কি?'

লজ্জা পেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল রুবি। 'ঠিক আছে, তাই বলব, মাসুদ ভাই।'

হেসে উঠল সবাই।

'আরে, এরা তো দেখছি খোশগল্পে মগ্ন হয়ে পড়ল!' ইস্কান্দারও হাসছে। 'আমাকে আজ রাতেই মাল্টা ফিরতে হবে। সন্ধের আগেই টেক-অফ করতে চাই।'

শাফির নেতৃত্বে দ্রুত মাল খালাস করার কাজ শুরু হলো। তার লোকজন প্লেনে ঢুকে রোলারে চড়াল ভারী বাক্সগুলো। মারটিন অবশ্য নিজের ফ্রন্ট-এন্ড

লোডার স্টার্ট দিল, বাছাই করা কিছু কার্গো নামিয়ে এনে জড়ো করল কাঁটাঝোপের আড়ালে। সূর্য পাটে বসেছে, এই সময় খালি হয়ে গেল প্লেন।

ককপিটে বসে শেষ একবার আলোচনা করল রানা ও ইস্কান্দার।

'আজ থেকে চারদিন পর,' একমত হলেন ইস্কান্দার, হ্যান্ডশেক করলেন রানার সঙ্গে।

'ভদ্রলোককে যেতে দাও, রানা,' নিচে থেকে হাঁক ছাড়ল শাফি। 'ভোরের আগে সীমান্ত পেরুতে হবে আমাদের।'

প্লেন ফিরে যাবার পর রুবিকে নিয়ে একটা ঝোপের সামনে বসল নিমা। আবার দেখা হওয়ায় দু'জনেই খুব খুশি।

'তোমাদের মাল-পত্র পাহারা দেয়ার জন্যে পুরো একটা কমব্যাট প্ল্যাটুন রেখে যাচ্ছি এখানে,' রানাকে বলল শাফি। 'সীমান্ত পর্যন্ত খুব ছোট একটা দল যাব আমরা। আপাতত এদিকে শত্রুপক্ষের তৎপরতা খুবই কম, কাজেই কোন বিপদ না হবারই কথা।'

'ইথিওপিয়ান বর্ডার কত দূরে?' জানতে চাইল রানা।

'পাঁচ ঘণ্টা হাঁটতে হবে,' বলল শাফি। 'চাঁদ ওঠার আগেই সীমান্ত পেরুতে চাই। আমার দলের বাকি লোকজন অ্যাবে গিরিখাদের মুখে অপেক্ষা করছে। কাল ভোরে ওদের সঙ্গে মিলিত হব।'

'ওখান থেকে মঠ পর্যন্ত?'

'আরও দু'দিনের পথ,' জবাব দিল শাফি। 'ওখানে কার্গো ড্রপ করবেন তোমার পাইলট, কাজেই পৌঁছুতে দেরি করলে চলবে না।'

প্ল্যাটুন কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলার জন্যে একপাশে সরে গেল শাফি, রোজিরেসে রেখে যাওয়া অবশিষ্ট কার্গো তার অধীনেই পাহারা দেবে গেরিলারা। তারপর ছ'জন লোককে ডাকল সে, বর্ডার পেরুবার সময় এসকর্ট হিসেবে থাকবে ওরা।

হঠাৎ গলা চড়িয়ে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল শাফি। 'ওটা উনি কোন্ বুদ্ধিতে প্লেনে করে এনেছেন, রানা?' থিয়ডালাইট-এর মোটাতাজা পায়াগুলোর দিকে বিরূপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। বিশাল এক বাক্স খুলে প্লেন থেকে ওটা বের করে এনেছে মারটিন।

মারটিন আরবী জানে না, কাজেই অনুবাদকের ভূমিকা নিতে হলো রানাকে। 'মারটিন বলছে ওটার ডেলিকেট ইন্সট্রুমেন্ট। প্লেন থেকে ড্রপ করার ঝুঁকি নিতে রাজি হয়নি। বলছে, এটার কোন ক্ষতি হলে যে কাজের জন্যে তাকে আনা হয়েছে সে-কাজ করতে পারবে না।'

'কে ওটা বহন করবে?' জিজ্ঞেস করল শাফি। 'আমার লোকদের বললে বিদ্রোহ করবে তারা।'

'বুনো ভাঁড়টাকে বলো আমি নিজে এটা বহন করব,' বলল মারটিন। 'তার বাঁদরগুলো এটা ছুঁলে তাদের হাত আমি ভেঙে দেব।' বোঝাটা হ্যাঁচকা টানে নিজের কাঁধে তুলে নিল সে।

হারকিউলিস ফিরে যাবার আধঘণ্টা পর অন্ধকার ও নিস্তব্ধ প্রান্তর ধরে রওনা

হলো ওরা, অ্যাডভান্স গার্ড পাঁচ মিনিট আগে রওনা হয়েছে। পুব দিকে যাচ্ছে ওরা। লম্বা পা ফেলে দ্রুত হাঁটছে শাফি। নিমা ভাবল, রানা আর শাফির চোখ শিকারী বিড়ালের মত সতর্ক; ওদের দু'জনের ঠিক পিছনেই রয়েছে ও। অন্ধকারে কিভাবে দেখতে পাচ্ছে কে জানে, মাঝে মধ্যেই ফিসফিস করে সাবধান করে দিচ্ছে ওকে–কখনও শাফি, কখনও রানা–সাবধান করায় গর্ত বা পাথরের স্তূপগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারছে নিমা। তারপরও যখন হোঁচট খেলো, সব সময় মনে হলো ওর পাশেই আছে রানা, শক্ত হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল প্রতিবার।

নিস্তব্ধতার ভেতর শৃংখলা বজায় রেখে এগোচ্ছে দলটা। প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ মিনিট করে বিশ্রাম। বিশ্রামের সময় একসঙ্গে বসছে রানা আর শাফি, ওদের দু'একটা কথা নিমার কানে ভেসে আসছে। অ্যাবে গিরিখাদে ওদের ফিরে আসার কারণটা শাফিকে ব্যাখ্যা করছে রানা। 'মামোস' আর 'টাইটা' শব্দ দুটো কয়েকবার উচ্চারণ করল রানা। শাফির ভরাট কণ্ঠস্বর থেকে প্রশ্নবোধক আওয়াজ বেরুচ্ছে। বিশ্রাম শেষে আবার শুরু হলো যাত্রা।

এক পর্যায়ে সময়ের আর কোন হিসাব থাকল না নিমার। শরীর ও মন দুটোই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। প্রতিটি পদক্ষেপ পরিশ্রম সাপেক্ষ ও কষ্টকর মনে হলো। ক্ষতটা প্রায় সেরে গেলেও, আবার ব্যথা শুরু হলো হাঁটুতে। মাঝে মধ্যে অনুভব করল রানা ওর বাহু ধরেছে, খানা-খন্দটুকু পার করে দিচ্ছে। আবার কখনও বা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল গোটা দল, সামনে থেকে নিচু গলার সতর্ক সংকেত ভেসে এসেছে। অন্ধকারে চুপচাপ অপেক্ষা। সবাই উত্তেজিত ও নার্ভাস। তারপর আরও একটা সংকেত এল। আবার শুরু হলো কষ্টকর পদযাত্রা। একবার নদীর গন্ধ পেল নিমা, ভাবল নীলনদের কাছাকাছি কোথাও রয়েছে ওরা। কেউ কোন কথা বলেনি, তবু পুরুষদের আড়ষ্ট ভাব লক্ষ্য করে বুঝতে পারল সামনে কিছু একটা আছে। গেরিলারা কাঁধ থেকে অস্ত্র নামিয়ে বাগিয়ে ধরল।

'সামনে বর্ডার,' নিমার মুখের কাছাকাছি নিঃশ্বাস ফেলল রানা। উত্তেজনাটা সংক্রামক। ক্লান্তির কথা ভুলে গেল নিমা। পালস রেট বেড়ে গেছে।

এক ঘণ্টা পার হলো। তবু বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামল না ওরা। আরও এক ঘণ্টা পর সামনে থেকে কারও হাসির অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এল। 'অল ক্লিয়ার,' নিমাকে বলল রানা। 'ইথিওপিয়ায় ঢুকে পড়েছি আমরা। আপনার খবর কি, নিমা?'

'ভাল আছি।'

'ক্লান্ত আমিও।' চাঁদের আলোয় হাসল রানা। 'খানিক পরই ক্যাম্প ফেলা হবে।'

সন্দেহ হলো মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে রানা। পথ যেন ফুরোবার নয়, কাজেই হাঁটারও কোন বিরাম নেই। এক সময় কান্না পেল নিমার। তারপর হঠাৎ নদীর আওয়াজ ভেসে এল কানে। ইতিমধ্যে ভোর হয়ে এসেছে। সামনে যারা অপেক্ষা করছিল, তাদের একজনের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেল শাফিকে। হাত ধরে পথ থেকে নিমাকে সরিয়ে আনল রানা, এক জায়গায় বসিয়ে নিজের হাতে খুলে দিল পায়ের বুট।

'[illegible] আপনি তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে নিয়ে গর্ব করা চলে,' নিমার মোজা খোলার সময় বলল রানা, পায়ের ফোস্কাগুলো পরীক্ষা করল। হাঁটুর ব্যান্ডেজটাও খুলল। সামান্য ফুলে আছে। নরম ছোঁয়ায় ডলে দিল রানা। 'পেইনকিলার দিচ্ছি, আরাম পাবেন।' ব্যাগ থেকে ট্যাবলেট বের করল ও। তারপর প্যাড লাগানো নিজের জ্যাকেটটা মাটিতে বিছাল। 'দুঃখিত, পিপিং ব্যাগ পিছনে ফেলে আসা হয়েছে। এয়ার ড্রপের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।' ট্যাবলেট আর পানির বোতলটা নিমার হাতে ধরিয়ে দিল। সবশেষে ইমার্জেন্সী রেশনের প্যাকটা খুলল।

মুখে খানিকটা শুকনো মাংস নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল নিমা। হাতে গরম এক মগ চা নিয়ে রানা যখন ওর ঘুম ভাঙাল, তখন বিকেল যাই যাই করছে। ওর পাশে বসে রানাও চুমুক দিচ্ছে নিজের মগে। 'শুনে খুশি হবেন, শাফি এখন সব কথাই জানে; আমাদেরকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে সে।'

'কতটুকু কি বললেন?'

'আগ্রহী করে তোলার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন।' ঠোঁট টিপে হাসল রানা। 'সব কথা একসঙ্গে বলা ঠিক না, প্রতিবার একটু একটু করে বলতে হয়। আমরা কি খুঁজছি, জানে। আরও জানে নদীতে একটা বাঁধ দিতে যাচ্ছি।'

'বাঁধ তৈরির জন্যে লোকবল দরকার, তার কি ব্যবস্থা?'

'সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের সন্ন্যাসীরা তার কথা শুনবেন। ওঁরা তাকে বীরপুরুষ বা হিরো বলে মনে করেন।'

'বিনিময়ে নিশ্চয়ই কিছু দেয়ার কথা বলেছেন। কি?'

'এ বিষয়ে এখনও কোন আলোচনা হয়নি। আমি বলেছি, কি পাব জানা নেই। হেসে উঠে বলল, আমাকে ও বিশ্বাস করে।'

'উনি খুব চালাক, তাই না?'

'চালাক শব্দটা যদি নিন্দার অর্থে ব্যবহার করেন, আমি একমত হব না,' বিড়বিড় করল রানা। 'আমি জানি সময় হলে স্পষ্ট করেই বলবে সাহায্যের বিনিময়ে কি সে চায়।' হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল ও। 'তোমার কথাই হচ্ছিল, শাফি।'

এগিয়ে এসে রানার পাশে উবু হয়ে বসল শাফি। 'আমাকে নিয়ে কি ষড়যন্ত্র করছিলে তোমরা?'

'নিমা বলছেন, তোমার মধ্যে দয়া-মায়া বলে কিছু নেই, সারারাত তাকে হাঁটিয়েছ।'

'রানা আসলে আপনাকে পঙ্গু বানাচ্ছে। দেখলাম তো, আপনাকে নিয়ে কি রকম ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমার কথা হলো, ওদের সঙ্গে কঠিন ব্যবহার করতে হবে। মেয়েরা সেটা উপভোগ করে।' তারপরই সিরিয়াস হয়ে উঠল শাফি। 'সত্যি দুঃখিত, নিমা। সীমান্ত মানেই হাজার রকম বিপদ। হোম গ্রাউন্ডে চলে এসেছি, এখন আর আমাকে আপনার অতটা দানব বলে মনে হবে না।'

নিমা বলল, 'ধ্যেত, আমরা তো আসলে আপনার প্রশংসা করছিলাম। সত্যি কৃতজ্ঞ বোধ করছি, শাফি।'

'রানা আমার পুরানো বন্ধু না!'

প্রসঙ্গ বদলে নিমা বলল, 'মঠে কি ঘটেছে রুবির কাছে খানিকটা শুনলাম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।'

রাগে দু'হাত দিয়ে ধরে নিজের দাড়ি টানছে শাফি। 'ওখানে যা ঘটেছে তার জন্যে ঘুমা আর তার ট্রুপাররা দায়ী। ওরা পশুরও অধম। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় আমরা কাদের বিরুদ্ধে লড়ছি। মেনজিসটুর নির্যাতন থেকে মুক্তি পেলাম, তার জায়গায় নতুন একটা আতংক ছড়িয়ে পড়ল।'

'ওখানে ঠিক কি ঘটেছে, শাফি?'

ধীরে ধীরে পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা দিল শাফি, বলল কি কি লুঠ হয়েছে। 'ঘুমা যে দায়ী তাতে কোন সন্দেহ নেই। সন্ন্যাসী যারা পালাতে পেরেছেন তাঁরা সবাই তাকে চেনেন।'

রাগে দাঁড়িয়ে পড়ল শাফি। থরথর করে কাঁপছে সে। 'যে-কোন গোজামবাসীর কাছে ওই মঠ প্রাণের চেয়েও প্রিয়। আমি নিজে ধর্ম-কর্ম করি না, কিন্তু যাঁরা করেন তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ আছে। ওলি জারকাসকে আমি গুরুজন বলে মানতাম। প্রধান পুরোহিতকে খুন করে আমাকে খেপিয়ে তুলেছে ওরা। এর ফল ওদেরকে ভোগ করতে হবে।' মাথায় ক্যাপ পরল সে। 'চলুন, এবার রওনা হতে হয়। সামনের পথ অত্যন্ত দুর্গম।'

আট

সীমান্ত অনেকটা পিছনে ফেলে আসায় এখন দিনের বেলাও হাঁটা নিরাপদ। দ্বিতীয় দিনের পদযাত্রা ওদেরকে গিরিখাদের গভীরে পৌঁছে দিল। বড় পাহাড়ের সামনে যে ছোট পাহাড় থাকে, এখানে তেমন কিছু নেই–এ যেন অকস্মাৎ মাথাচাড়া দেয়া একটা বিশাল দুর্গে ঢুকে পড়া। দু'দিকে পাহাড়ের স্তূপ বা গুচ্ছের পাঁচিল প্রায় চার হাজার ফুট ওপরের আকাশ ছুঁয়েছে, মাঝখানের গভীরতায় সাপের মত এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে নদীটা, দৈর্ঘ্যের যত দূর দেখা যায় আলোড়ন আর উচ্ছ্বাস, দ্রুতগতি স্রোত আর ঘূর্ণি সমস্ত পানিকে সাদা করে রেখেছে। দুপুরে নদীর ধারে ঝোপ আর গাছপালার নিচে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামার অনুমতি দিল শাফি। ওদের নিচে সৈকত, প্রকাণ্ড সব বোল্ডারের ছড়াছড়ি। ওগুলো নিশ্চয়ই পাহাড়-প্রাচীরের গা বেয়ে গড়িয়ে নেমেছে।

সামান্য ব্যবধানে বসে আছে ওরা পাঁচজন। থিয়ডালাইট নিয়ে শাফির সঙ্গে মারটিনের মন কষাকষি এখনও থামেনি। মারটিন বেশি কথা না বলে নির্লিপ্ত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারী ইন্সট্রুমেন্টটার কাছাকাছি বসে আছে সে। শাফি আর রুবি একদমই চুপচাপ। তবে হঠাৎ রুবি হাত লম্বা করে শাফির বাহু স্পর্শ করল। 'ওদেরকে আমি জানাতে চাই,' বলল সে।

উত্তর দেয়ার আগে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকল শাফি, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'অসুবিধে কি,' বলল সে, কাঁধ ঝাঁকাল।

'আমি চাই ওরা জানুন,' আবার বলল রুবি। 'উস্তাভকে ওঁরা চিনতেন। কাজেই বুঝবেন।'

'তুমি চাও আমি বলি?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল শাফি, রুবির একটা হাত ধরল।

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল রুবি। 'তুমি বললেই ভাল হয়।'

কিছুক্ষণ কথা বলল না শাফি, নিজের চিন্তা-ভাবনা গুছিয়ে নিচ্ছে। তারপর যখন শুরু করল, রানা বা নিমার দিকে তাকাল না, তাকিয়ে থাকল রুবির দিকে। 'এই মেয়েটার ওপর প্রথম যখন আমার চোখ পড়ল, উপলব্ধি করলাম ওর আর আমার নিয়তি এক সুতোয় বাঁধা।'

শাফির আরও গা ঘেঁষে বসল রুবি।

'রুবি আর আমি তিমকাত উৎসবের রাতে শপথ নিই এবং ঈশ্বরের ক্ষমা প্রার্থনা করি, তারপর আমি ওকে আমার মেয়েমানুষ হিসেবে গ্রহণ করি।'

শাফির পেশীবহুল কাঁধে হাত রাখল রুবি।

'রাশিয়ান লোকটা আমাদের পিছু নিল। সে এইখানটায় আমাদেরকে ধরে ফেলে, ঠিক এখন যেখানে বসে আছি। আমি তাকে আলোচনায় বসে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে বললাম। কিন্তু সে রাজি হলো না। তখন আমি বললাম, রুবি যদি স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে যেতে রাজি হয়, আমি বাধা দেব না। সে বলল, রুবিকে চায় না, চায় ওর লাশ। তারপরই গুলি করল সে, প্রথমে আমাকে লক্ষ্য করে, তারপর রুবিকে। কিন্তু সে জানত না, আড়াল থেকে তার ওপর আমার লোকজন নজর রাখছিল।'

ঘটনাটা স্মরণ করে শিউরে উঠল রুবি।

'উস্তাভ নিজের বোকামিতে মারা গেছে। তার লাশটা আমরা নদীতে ভাসিয়ে দিই।'

'উস্তাভ যে মারা গেছে আমরা তা জানি,' এই প্রথম কথা বলল নিমা। তারপর প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্যে জিজ্ঞেস করল, 'মঠে পৌঁছুতে আর কতক্ষণ লাগবে আমাদের?'

'এখুনি রওনা হলে সন্ধের আগেই পৌঁছে যাব,' বলল শাফি।

ময়সি মাতুবা, সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের নব নির্বাচিত প্রধান পুরোহিত, মঠের টেরেসে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর মাথায় রুপোলি চুল, ওলি জারকাসের চেয়ে বয়েস কিছু কম হবে, একহারা ও লম্বা। আজ তিনি বিশিষ্ট অতিথি অ্যাল্যান শাফির সম্মানে নীল মুকুটটা পরেছেন।

অতিথিদের জন্যে আলাদা সেল বরাদ্দ করা হয়েছে, গোসলের পর সেখানে এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিল ওরা। তারপর সন্ন্যাসীরা এসে নিয়ে গেলেন ওদেরকে। খানাপিনার বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। তেজ-এর পাত্র তৃতীয়বার ভরার পর প্রধান পুরোহিত আর সন্ন্যাসীদের মন-মেজাজ হালকা ও নরম হয়ে উঠল, লক্ষ করে ময়সি মাতুবার কানে ফিসফিস করল শাফি।

'সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের ইতিহাস নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে—ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ

সাগর থেকে কিভাবে ঈশ্বর তাঁকে আমাদের তীরে তুলে দিলেন, তিনি যাতে আমাদের সত্যিকার ঈমানদার হতে সাহায্য করতে পারেন?'

প্রধান পুরোহিতের চোখ পানিতে ভরে উঠল। 'তাঁর পবিত্র শরীর এখানে সমাধিস্থ করা হয়, আমাদের মাকডাসে। বর্বররা এল, আমাদের ধর্মীয় ঐশ্বর্য লুঠ করে নিয়ে গেল। আমরা পিতৃহীন বালকে পরিণত হয়েছি। এখন আর পুণ্য অর্জনের জন্যে ইথিওপিয়ার প্রতিটি প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা এখানে আসবে না। আমরা নিঃস্ব হয়ে গেছি। এই মঠ ধ্বংস হয়ে যাবে। সন্ন্যাসীরা চলে যাবে ঝরে পড়া পাতার মত।'

'সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াস যখন ইথিওপিয়ায় আসেন, একা আসেননি। বাইজানটিয়াম চার্চ থেকে তাঁর সঙ্গে আরও একজন ক্রিশ্চান এসেছিলেন,' নরম সুরে তাঁকে মনে করিয়ে দিল শাফি।

'সেইন্ট অ্যান্টোনিয়া,' তেজ পাত্র থেকে আরও এক ঢোক পান করলেন, প্রধান পুরোহিত।

'সেইন্ট অ্যান্টোনিয়া,' সায় দিল শাফি। 'সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের আগেই তিনি মারা যান। তবে তিনি তাঁর ভাইয়ের চেয়ে কম পবিত্র ছিলেন না।'

'অবশ্যই তিনি অতি পবিত্র এবং মহান সেইন্ট ছিলেন, আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁর প্রাপ্য,' বলে আরও এক ঢোক তেজ পান করলেন ময়সি মাতুবা।

'ঈশ্বরের চাল বড়ই রহস্যময়, নয় কি?' সবিস্ময়ে মাথা নাড়ল শাফি।

'তাঁর পথ অত্যন্ত গভীর, আমাদের বুঝতে চাওয়ার বা প্রশ্ন তোলার কোন অধিকার নেই।'

'তবে তিনি করুণাময়, এবং বিশ্বাসীদের পুরস্কৃত করেন।'

'তিনি পরম করুণাময়,' ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন প্রধান পুরোহিত।

'আপনারা, আপনাদের মঠ, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে,' বলল শাফি। 'সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসকে লুঠ করে নিয়ে গেছে ওরা—হায়, তা আর কোনদিন উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কিন্তু ঈশ্বর যদি আরেকজনকে পাঠান, তাহলে কেমন হয়? তিনি যদি আপনাদেরকে সেইন্ট অ্যান্টোনিয়ার শরীর পাঠিয়ে দেন, তখন আপনারা কি করবেন?'

ভেজা চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো, মনে হলো প্রধান পুরোহিত একটা হিসাব মেলাবার চেষ্টা করছেন। 'সেটা হবে সত্যিকার একটা মিরাকল।'

বৃদ্ধ প্রধান পুরোহিতের কাঁধে একটা হাত রেখে নরম সুরে ফিসফিস করল শাফি, কান্না থামিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনছেন ময়সি মাতুবা।

'শ্রমিকের ব্যবস্থা করা হয়েছে,' পরদিন সকালে উপত্যকার ঢাল বেয়ে ওঠার সময় রানাকে বলল শাফি। 'ময়সি মাতুবা কথা দিয়েছেন দু'দিনের মধ্যে একশো লোক যোগাড় করে দেবেন। আরও পাঁচশো দেবেন আগামী হপ্তায়। দূর-দূরান্তের ক্রিশ্চান গ্রামগুলোয় খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন উনি, বাঁধ তৈরির কাজে সাহায্য করলে নরকের আজাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, কারণ এই বাঁধ তৈরির মাধ্যমে উদ্ধার হবে সেইন্ট অ্যান্টোনিয়ার পবিত্র দেহাবশেষ।'

দুই মেয়েই ঢালের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল।

'বেচারা বুড়ো মানুষটাকে এসব বলে লোভ দেখিয়েছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল রুবি।

'সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের বদলে অন্য একজন সেইন্টের দেহ। আমরা যদি সমাধিটা খুঁজে পাই, মঠের পাওনা হবে মামোসের মমি।'

'কাজটা অত্যন্ত নীচ হয়েছে,' বিস্ফোরিত হলো নিমা। 'সাহায্য পাবার বিনিময়ে আপনি তাঁকে চিট করবেন?'

'কেন, চিট করা হবে কেন?'

অভিযোগ শুনে রেগে গেল শাফি। 'কোন প্রমাণ নেই যে ওটা আসলেই সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের লাশ ছিল। অথচ তারপরও কয়েকশো বছর ধরে এলাকার ক্রিস্চানদের ঐক্যবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্য পূরণ করছিল, গোটা ইথিওপিয়ার তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করছিল, উৎসাহ দিচ্ছিল ভক্তবৃন্দকে সন্ন্যাসী হতে। এখন সেটা লুঠ হয়ে যাওয়ায় মঠের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে।'

'তাই আপনি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেবেন?' নিমা এখনও রেগে আছে।

'ওঁরা যেটা হারিয়েছেন সেটার চেয়ে কোন অংশে মামোসের লাশ কম অথেনটিক নয়। প্রাচীন ক্রিস্চানের লাশের বদলে প্রাচীন মিশরীয়র লাশ হলে কি আসে যায়, যদি সবগুলো উদ্দেশ্য সেটা পূরণ করতে পারে, এবং আরও পাঁচশো বছর টিকে থাকতে পারে মঠটা?' রানার দিকে ফিরল শাফি। 'তুমি কি বলো, রানা?'

'ধর্মীয় ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না,' বলল রানা। 'তবে মনে হচ্ছে শাফির কথায় খানিকটা বোধহয় যুক্তি আছে।'

'ক্রিস্চানিটি সম্পর্কে আপনি আবার কবে থেকে এক্সপার্ট হলেন? আপনি তো, আমি যতদূর জানি, অজ্ঞেয়বাদী।'

'নো কমেন্ট,' বলে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে হাতজোড় করে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমি বরং যাই মারটিনের সঙ্গে বাঁধটা নিয়ে আলোচনা করি।' হন হন করে এগিয়ে এঞ্জিনিয়ারের পাশে চলে এল, লাইনের একেবারে মাথায়।

পিছন থেকে মাঝে মধ্যেই উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের আওয়াজ ভেসে আসছে রানার কানে। আপনমনে হাসল ও। শাফিকে ওর চেনা আছে, নতুন করে চেনা হচ্ছে নিমাকে। ওদের মধ্যে কে জেতে দেখার খুব আগ্রহ জাগল।

মাঝ দুপুরে গহ্বরের মাথায় পৌঁছুল ওরা। ক্যাম্প ফেলার জন্যে জায়গা খুঁজছে শাফি, মারটিনকে নিয়ে নদীর সরু গলায় চলে এল রানা, ঠিক নদী যেখানে জলপ্রপাতে পরিণত হয়ে নিচে লাফ দিয়েছে, তার ওপরে। থিয়ডালাইট সেট করার পর হাত ইশারায় রানাকে লেভেলিং স্টাফ নিয়ে পাহাড়-প্রাচীরে ওঠা-নামা করতে বলল মারটিন, সারাক্ষণ থিয়ডালাইটের লেন্সে চোখ। ওঠা-নামা করার সময় লেভেলিং স্টাফটা খাড়া রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে রানা।

'ঠিক আছে,' হাঁক ছাড়ল মারটিন, বিশটা শট নেয়ার পর। 'এবার তুমি নদীর ওপারে চলে যাও।'

'কি বলে! কিভাবে যাব? সাঁতরে, নাকি উড়ে?'

উজানের দিকে তিন মাইল হাঁটতে হলো রানাকে, ট্রেইলটা যেখানে অগভীর ডানডেরা নদীর ওপর দিয়ে ওপারে পৌঁচেছে। ওপারে পৌঁছে কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে উল্টোদিকে হাঁটতে হলো ওকে, থামল অপর পাড়ে বসে যেখানে মারটিন সিগারেট ফুঁকছে। 'ফুসফুসে ক্যান্সার বাধিয়ো না, কেমন?' পানির এদিক থেকে চিৎকার করে বলল রানা।

প্রয়োজনীয় শট নিতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ফেরার জন্যে আবার নদীর অগভীর অংশটুকু পার হতে হলো রানাকে। শেষ এক মাইল প্রায় গাঢ় অন্ধকারে হাঁটতে হলো ওকে, তবে পথ দেখাল ক্যাম্পসাইটের কাঁপা কাঁপা অস্পষ্ট আলো। ক্যাম্পে পৌঁছে লেভেলিং স্টাফটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'এত খাটালে, ফলটা কি পেলাম?'

পাইড রুল থেকে চোখ তুলল না মারটিন। লণ্ঠনের আলোয় ড্রইংগুলো স্টাডি করছে সে, কিছু রদবদলও করছে। 'তোমার আনুমানিক হিসাব প্রায় নির্ভুলই বলতে হবে,' এক সময় মুখ তুলে বলল সে। 'জলপ্রপাতের ওপর ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে নদীটা একচল্লিশ গজ চওড়া, যেখানে আমি স্ট্রাকচারটা খাড়া করতে চাই।'

'আমি শুধু জানতে চাই ওখানে একটা বাঁধ তৈরি করা সম্ভব কিনা।'

নাকের পাশে আঙুল ঘষল মারটিন, হাসছে। 'তুমি আমাকে আমার লাল ফ্রন্ট-এন্ডার এনে দাও, আমি নীলনদকেও বাঁধতে পারব।'

রাত একটু বেশি হতে আগুনের ধারে বসে সবাই একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া সারল। ক্যাম্পফায়ারের ওদিক থেকে রানার দিকে তাকিয়ে আছে নিমা, চোখাচোখি হতে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে আমন্ত্রণ জানাল। কয়েক সেকেন্ড পর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাম্প এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, একবার পিছন ফিরে দেখে নিল রানা ওকে অনুসরণ করছে কিনা। পাশে চলে এসে টর্চ জ্বালল রানা, দু'জন ফিরে এল আবার ড্যাম সাইটে, বসল একটা বোল্ডারের ওপর।

টর্চ নিভিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল ওরা, চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে তারার আলোয় এখন অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। নিস্তব্ধতা ভাঙল নিমা, খুব নিচু গলায় কথা বলছে, 'গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে, জানেন। ভেবেছিলাম আর বোধহয় কোনদিন এখানে আমাদের ফিরে আসা হবে না।'

'শাফি আর প্রধান পুরোহিত সাহায্য না করলে ব্যাপারটা সম্ভব হত না।'

'শাফি আর আপনিই জিতলেন,' ক্ষীণ হাসির শব্দ নিমার গলায়। 'হ্যাঁ, সন্ন্যাসীদের সাহায্য আমাদের দরকার। স্বীকার করছি, শাফির সঙ্গে তর্কে-পারা সম্ভব নয়।'

'তারমানে পুরস্কার হিসেবে ওদেরকে মামোসের মমি দিতে আপনার কোন আপত্তি নেই?'

'যে মমিই পাই, আদৌ যদি পাই,' বলল নিমা। 'আমরা যত দূর জানি,

আসল মামোসের মমিটা চুরি করে নিয়ে গেছেন কর্নেল ঘুমা।'

খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিমার কাঁধটা এক হাতে জড়িয়ে ধরল রানা। কিন্তু নিমা ব্যাপারটাকে ঠিক সহজভাবে নিল না। আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর। তবে কিছু বলল না, হাতটাও সরিয়ে দিল না, খানিক পর বরং একটু পর ঢিল পড়ল পেশীতে। 'ওহ্, রানা, আমার যেমন ভয় লাগছে তেমনি উত্তেজিত হয়ে আছি। ভয় লাগছে এই ভেবে যে আমাদের আশা হয়তো পূরণ হবে না। আর উত্তেজিত হয়ে আছি এই আশায় যে টাইটার সঙ্গে খেলাটায় আমরাই জিতব।' মুখ ফেরাল, ওর নিঃশ্বাস অনুভব করল রানা নিজের ঠোঁটে।

ঠিক এই সময়টার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল রানা। নিমাকে চুমো খেতে গেল ও।

কোন তরুণীকে দেখে লোভনীয় মনে হলে রানার স্বাভাবিক প্রবণতা হলো সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নেয়া, নিজেকে চোখ রাঙানো, সংযমী ও সভ্য-ভব্য হবার কথা স্মরণ করা। নিমার ক্ষেত্রেও এ-সবের ব্যতিক্রম ঘটেনি। তারপর ওরা লন্ডন থেকে ইথিওপিয়ায় এল, দুর্গম পার্বত্য-এলাকায় একসঙ্গে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াল, হাস্য-কৌতুক ভাগাভাগি করল, একসঙ্গে রাত কাটাল কোয়ারিতে। পরস্পরকে জানার সুযোগ পেয়েছে ওরা, পরস্পরকে ভাল লাগার অনেক কারণ সৃষ্টি হয়েছে। তবে যতই ঘনিষ্ঠতা হোক, নিমার তরফ থেকে কখনোই কোন আমন্ত্রণ আসেনি। আর রানাও কঠিন ব্রত পালনের মত সংযম রক্ষা করে আসছিল। তারপর সব ওলটপালট হয়ে গেল ফেরার পথে, নিমাকে যখন পিঠে তুলে এসকার্পমেন্টের চূড়ায় উঠতে হচ্ছে ওকে। নারীদেহের তীব্র আকর্ষণ উন্মাদপারা করে তুলেছিল, যদিও ক্লান্তি এমনভাবেই গ্রাস করে যে তার কোন প্রকাশ ঘটেনি। তা না ঘটলেও, সেই ঘটনার পর রানার মনের একটা দিক প্রায় ধরেই নিয়েছে যে নিমার প্রতি ওর অধিকার জন্মেছে। অবশ্য তারপরও রানা সংযম হারায়নি। অপেক্ষা করেছে নিমা কখন ইঙ্গিত দেবে।

আজ নিমার কাঁধে হাত রাখার সময় কিছু ভাবেনি রানা, কোন স্বার্থবুদ্ধি কাজ করেনি। তবে হাতটা নিমা সরিয়ে না দেয়ায় অধিকারের কথাটা মনে পড়ে গেল। উৎসাহী হয়ে উঠল মন। ভাবছে, নিমার অন্তত আপত্তি হবে না। চুমো খেতে চাওয়ার সেটাই কারণ।

কিন্তু ধাক্কা খেতে হলো। ঝট করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল নিমা। বোল্ডার থেকে নেমে পড়ল। 'না!'

রানাও নিজেকে সামলে নিয়েছে। 'সরি,' ম্লান সুরে বলল ও। 'সত্যি দুঃখিত।'

'না, আমি দুঃখিত,' দ্রুত ফিসফিস করল নিমা। 'আমারই আসলে উচিত ছিল আপনাকে সাবধান করা।'

কথা না বলে তাকিয়ে আছে রানা।

'আপনাকে আমার অসম্ভব ভাল লাগে,' আবার বলল নিমা। 'আমি অকৃতজ্ঞও নই, রানা।' কথা বলার সময় প্রায় হাঁপাচ্ছে। 'কিন্তু ক্রিশ্চান হলেও আমি অত্যন্ত রক্ষণশীল একটা সমাজে বড় হয়েছি। তাই···সত্যি আমি দুঃখিত, রানা।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' জোর করে হাসল রানা। 'এতে এত বিব্রত বোধ করার কিছু নেই।' তারপর গলা একেবারে খাদে নামিয়ে বলল, 'আমি অপেক্ষা করতে রাজি আছি।'

'কিছু বললেন?'

'না, কিছু বলিনি,' অস্বীকার করল রানা। 'চলুন, আপনাকে ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।'

'হ্যাঁ, তাই চলুন।'

পরদিন ভোরের আলো ভাল করে ফোটার আগেই ময়সি মাতুবার প্রতিশ্রুতি অনুসারে সন্ন্যাসীদের প্রথম দলটা উপত্যকা বেয়ে উঠে এল। এক লাইনের একটা মিছিল, সন্ন্যাসীরা সবাই তরুণ, সবার পরনে সাদা আলখেল্লা, সুর করে গান করতে করতে আসছে।

'কি সর্বনাশ!' অকারণে হাসি পাচ্ছে রানার। 'আবার না ক্রুসেড বেঁধে যায়।'

একটা হাই তুলে নিমা বলল, 'ওরা নিশ্চয়ই মাঝরাতে রওনা হয়েছে!'

ডাকাডাকি করে রুবিকে খুঁজল রানা, সে কাছে আসার পর বলল, 'অনুবাদক হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হলো তোমাকে। মারটিন অ্যামহ্যারিক বা আরবীর একটা বর্ণও জানে না, কাজেই ওর কাছাকাছি থাকতে হবে তোমাকে।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই।'

দিনের আলো আরও উজ্জ্বল হতে শাফিকে নিয়ে ড্রপ সাইট দেখতে বেরুল রানা। দুপুরের দিকে সিদ্ধান্তে এল, উপত্যকাটাই ব্যবহার করতে হবে। ওদেরকে ঘিরে পাথুরে যে রিজগুলো দাঁড়িয়ে আছে, তার তুলনায় উপত্যকার মেঝেই বেশি সমতল, বাধা-বিঘ্নও কম। তাছাড়া, প্লেন থেকে জিনিসগুলো ফেলা দরকার ড্যাম সাইটের যতটা সম্ভব কাছাকাছি।

পরদিন সকালে নির্বাচিত সাইটে দাঁড়িয়ে শাফিকে রানা বলল, 'টাইম একটা মেজর ফ্যাক্টর। প্রতিদিন একটু একটু করে এগিয়ে আসছে বর্ষা।'

আকাশের দিকে তাকাল শাফি। 'সন্ন্যাসীদের ধরলে ওরা দেরিতে বর্ষা শুরু করার জন্যে প্রার্থনায় বসবে।'

ড্রপ শুরু করার আগে প্লেন নিয়ে পাঁচ মাইল সোজা এগিয়ে আসার মত উন্মুক্ত আকাশ পাবেন ইস্কান্দার। ফ্লেয়ার আর মার্কার গতকালই কিছু কিছু বসানো হয়েছে, আজ সেগুলো চেক করল ওরা। উপত্যকার মাথায় রয়েছে মারটিন, আকাশের গায়ে তার নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে: স্মোক ফ্লেয়ার সেট করছে সে। ঘাড় ফিরিয়ে উল্টো দিকে তাকাল রানা, উপত্যকার দূর প্রান্তে একটা পাথরের ওপর বসে রয়েছে নিমা আর রুবি। ওদেরকে ফ্লেয়ার বসাতে সাহায্য করেছে মারটিন। শাফির লোকজন এখনও মার্কার বসানোর কাজ পুরোপুরি শেষ করতে পারেনি, তবে জানিয়েছে আর বেশি সময় নেবে না।

সব কিছু সুষ্ঠুভাবেই ঘটল। ঘড়ির কাঁটা ধরে উড়ে এল ইস্কান্দারের প্রকাণ্ড হারকিউলিস। মোট ছ'বার উপত্যকার ওপর দিয়ে উড়ে গেলেন তিনি, প্রতিবার চারটে করে ভারী ও চৌকো বাক্স ফেললেন নিচে। বাতাসে ভর করে

প্যারাসুটগুলো উপত্যকার নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আগেই নির্দেশ দেয়া আছে, দল বেঁধে ছুটল তরুণ সন্ন্যাসীরা, বাক্সগুলো ধরাধরি করে তুলে আনবে। রানা, শাফি আর মারটিন আলোচনা করে আগেই ঠিক করে রেখেছে ক্যাম্পের কোথায় কি রাখা হবে। প্রতিটি বাক্সে নম্বর দেয়া আছে, নম্বর দেখে বোঝা যাবে কোনটায় কি আছে। এক নম্বর বাক্সে আছে শুকনো খাবার, ওদের ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র, ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট, মশারি সহ; শাফিকে খুশি করার জন্যে কয়েক বোতল হুইস্কিও আনা হয়েছে। এই বাক্সটার দায়িত্বে রানা নিজে থাকল।

নির্মাণ সামগ্রী আর হেভি ইকুইপমেন্টের দায়িত্ব থাকল মারটিনের ওপর। তার নির্দেশ অনুবাদ করছে রুবি, সন্ন্যাসীরা বাক্সটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রাচীন কোয়ারিতে।

রাত হয়ে গেল, অথচ অর্ধেক বাক্সও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, যেখানে পড়েছে সেখানেই পড়ে থাকল। সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা করল শাফি, কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয় সে।

পরদিন আবার হারকিউলিস নিয়ে ফিরে এলেন ইস্কান্দার, এবার তিনি রোজিরেস থেকে কার্গো তুলে এনেছেন। সব বাক্স উপত্যকা থেকে তুলে আনতে আরও দুটো দিন লেগে গেল। প্রায় সবই জমা করা হলো প্রাচীন কোয়ারিতে, বাক্স খোলার পর জিনিসগুলো এমনভাবে সাজানো হলো যাতে যেটা যখন দরকার চাইলেই পাওয়া যাবে।

এই ক'দিন কাজ করার সময় সন্ন্যাসীদের ওপর নজর ছিল রানার, কয়েকজনের পরিচয় আলাদাভাবে জানার সুযোগ হয়েছে। এদের মধ্যে কারও কারও রয়েছে নেতৃত্ব দেয়ার গুণ। দু'একজন আরবী ও অল্পস্বল্প ইংরেজী জানে। তাদের মধ্যে একজন টোরা নাবু। রানা তাকে সহকারী হিসেবে বেছে নিল, দোভাষীর কাজও চালানো যাবে।

ক্যাম্প গুছিয়ে নেয়ার পর কাজ ভাগাভাগির পালা। নিমা আর রুবির কাছ থেকে রানাকে দূরে সরিয়ে এনে শাফি বলল, 'এখন থেকে আমার কাজ হবে সাইটের সিকিউরিটি রক্ষা করা। তৃতীয়বার হামলা করতে পারে ঘুর্মা, কাজেই প্রস্তুত থাকা দরকার। তোমরা যে খাদে ফিরে এসেছ, এ খবর পেতে দেরি হবে না তার।'

'শাবলের চেয়ে একে-ফরটিসেভেনই মানাবে তোমার হাতে,' সায় দিল রানা। 'তবে রুবিকে এখানে রেখে যাও। ওকে আমার দরকার।'

'তা থাকুক, তবে আশা করব ওর ওপর নজর রাখবে তুমি। রাতে এসে একবার করে দেখে যাব আমি।'

নিজের লোকজনকে ডিফেন্সিভ পজিশনে পাঠিয়ে দিল শাফি। ট্রেইলের অনেক দূর পর্যন্ত থাকল তারা, ক্যাম্পের চারধারেও পজিশন নিল। কাজ থেকে মুখ তুলে তাকালে রানা তাদের দু'একজনকে উঁচু জমিনের মাথায় নড়তে চড়তে দেখতে পায়।

সেই থেকে রোজ রাতে ক্যাম্পে এসে রুবির সঙ্গে মিলিত হচ্ছে শাফি। কোন কোন গভীর রাতে রুবির তাঁবু থেকে তার ভরাট গলার উল্লাসধ্বনি ভেসে আসে,

তার সঙ্গে মিশে থাকে রুবির জলতরঙ্গ হাসি। তখন নিমার কথা মনে পড়ে যায় রানার। পাশের তাঁবুতেই রয়েছে মেয়েটা, অথচ কত দূরে। একসঙ্গে যখন থাকে, কারণে-অকারণে রানার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ও, কিন্তু রানা হাত ধরলেই আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। মেয়েটাকে ঠিক বুঝতে পারা যায় না।

পঞ্চম দিনে তিনশো শ্রমিক পাঠালেন ময়সি মাতুবা। এরা কেউই সন্ন্যাসী নয়, পাহাড়ী গ্রামগুলোর তরুণ অধিবাসী। সবাইকে নিয়ে দল গঠন করা হলো, প্রতি দলে থাকল ত্রিশজন শ্রমিক। দলের নেতা নির্বাচন করা হলো একজন সন্ন্যাসীকে। বাঘ, সিংহ, মৌমাছি–এভাবে রাখা হলো দলের নাম। স্বেচ্ছাসেবক হয়ে এসেছে সবাই, একঘেয়ে লাগলেই পালাবে। তাই পারিশ্রমিক দেয়ার কথা ঘোষণা করল রানা, কাজের বিনিময়ে সবাইকে রুপালি ডলার, অর্থাৎ মারিয়া থেরেসা দেয়া হবে। একটা লোহার সিন্দুকে ভরে এই ডলার প্রচুর পরিমাণে নিয়েও এসেছে রানা।

ফ্রন্ট-এন্ডারের উঁচু সীটে বসে কলকাঠি নাড়ল মারটিন, ট্র্যাক্টরের হাইড্রলিক বাহু তুলে নিল তারের জাল দিয়ে তৈরি প্রথম গ্যাবিয়ন। বোল্ডার ভর্তি পার্সেল, ওজন হবে কয়েক টন। সবাই যে যার কাজ ফেলে ডানডেরা নদীর কিনারায় জড়ো হয়েছে দেখার জন্যে। হলুদ ট্র্যাক্টর নিয়ে খাড়া পাড় বেয়ে সাবধানে নেমে যাচ্ছে মারটিন, বিস্ময়সূচক গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। গ্যাবিয়ন শূন্যে ঝুলছে, নদীতে নেমে এলে ট্র্যাক্টর। বাধা পেয়ে খেপে উঠল নদীর স্রোত, পিছনের চাকার চারপাশে ফণা তুলছে! কিছুই গ্রাহ্য করছে না মারটিন, নদীর আরও গভীরে নেমে যাচ্ছে সে।

মেশিনটার পেট ডুবে গেল পানিতে। সন্ন্যাসীরা গান ধরল, বাকি সবাই তালি দিচ্ছে। মেশিন লক করে ব্রেক কষল মারটিন, ভারী গ্যাবিয়ন নিচে নামিয়ে এনে খালাস করল পানিতে, তারপর পিছিয়ে আনছে ট্র্যাক্টর। গ্যাবিয়ন সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেছে, তবে ছোট একটা ঘূর্ণি ওটার অবস্থান চিহ্নিত করছে। নদীর কিনারায় আরেকটা গ্যাবিয়ন তৈরি রাখা হয়েছে, হাইড্রলিক বাহু তুলে নিল সেটাকে।

চিৎকার করে শ্রমিদের কাজে ফিরতে বলল রানা। উপত্যকা ধরে এক লাইনে উঠতে শুরু করল তারা। রানার নির্দেশে কাজের সময় তারা শুধু ল্যাঙট বা নেংটি পরে আছে। প্রচণ্ড গরমে দরদর করে ঘামছে সবাই, কয়লার মত কালো চামড়া চকচক করছে।

কোয়ারি থেকে পাথর বয়ে আনতে হচ্ছে নদীর কিনারায়, ওখানে তারের জালে ভরা হচ্ছে গ্যাবিয়ন।

প্রথম কয়েকদিন কাজের কোন অগ্রগতি খালি চোখে ধরা পড়ল না। জালে আটকানো যত বোল্ডারই ফেলা হলো সব বেমালুম হজম করে ফেলছে ডানডেরা। তারপর অবশ্য ধীরে ধীরে উঁচু হতে শুরু করল বাঁধ। অমনি কাজের উৎসাহ বেড়ে গেল সবার। আরও দু'দিন পর নদীর এদিক থেকে পানিতে বোল্ডার ফেলা অসম্ভব মনে হলো, এবার কাজ শুরু করতে হবে নদীর ওপার থেকে।

শ্রমিকদের ঘন ঘন আসা-যাওয়ায় ডানডেরার অগভীর পয়েন্ট পর্যন্ত একটা

রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। ট্যাক্টরটাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওপারে, একশো লোক রশি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে গেছে। ওখান থেকে ড্যাম সাইটে আসার জন্যে আরও একটা পথ তৈরি করতে হলো। তারপর থেকে প্রতিদিন কয়েক মিটার করে লম্বা হচ্ছে বাঁধটা, মাঝখানের ফাঁক ক্রমশ সরু হয়ে আসছে।

ওদিকে পিঁপড়ে আর কাঁকড়া, শ্রমিকদের দুটো দল, ড্যাম সাইট থেকে দুশো মিটার দূরে কঠিন পরিশ্রম করছে। জঙ্গল থেকে কেটে আনা গাছের কাণ্ড দিয়ে ভেলা তৈরি করছে তারা। গাছের কাণ্ড পাশাপাশি জোড়া লাগিয়ে হেভি পিভিসি দিয়ে মোড়া হচ্ছে, ওয়াটারপ্রুফ করার জন্যে। কাঠামোটার ওপর চাপানো হচ্ছে একই আকৃতির আরও একটা কাঠামো। দৈত্যাকার একটা স্যান্ডউইচ তৈরি হলো, বাঁধা হলো মোটা তার দিয়ে। সবশেষে জোড়া লাগানো কাঠামোর একপ্রান্তে বোল্ডার ভরে ব্যালাস্ট তৈরি করা হলো। ভেলার একটা দিক ভারী করতে চেয়েছে মারটিন, ওটা যাতে পানিতে প্রায় খাড়াভাবে ভেসে থাকে—একটা প্রান্ত নদীর তলায় আঁচড় কাটবে, অপরপ্রান্তটা ভেসে থাকবে সারফেসের ওপর। এই ভেলা বাঁধের দুই বাহুর মাঝখানের ফাঁকে আলম্ব বা ঠেকনা হিসেবে কাজ করবে।

হাতি, মোষ আর গণ্ডার, এই তিনটে দল উপত্যকার মাথায় মাটি খুঁড়ে একটা খাল তৈরি করছে; নদী দিক বদলে ওই খালে ঢুকবে।

পনেরো দিনের দিন তৈরি হয়ে গেল বাঁধ। সেদিনই নতুন কাটা খাল বেয়ে ছুটল ডানডেরা, কিছুদূর গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল গোটা উপত্যকায়।

খালের পাড় ধরে নিমাকে নিয়ে হাঁটছে রানা, লম্বা উপত্যকার পুরোটা দৈর্ঘ্য পেরিয়ে এল ওরা। অবশেষে সেই প্রবাহটার কাছে পৌছুল দু'জন, যে ঝর্ণায় বাটির সঙ্গে এসেছিল ওরা—বাটি হাত লম্বা করায় আঙুলে এসে বসেছিল রঙিন প্রজাপতি। পাড়ে এসে দাঁড়াল ওরা, তারপর কথা না বলে পরস্পরের দিকে তাকাল। প্রবাহটা নেই, শুকিয়ে গেছে।

ঘুরে গিয়ে খালি ঝর্ণার তলা অনুসরণ করল ওরা, ঢাল বেয়ে উঠছে। খানিক দূর ওঠার পর একটা কার্নিসে পৌছুল, প্রজাপতি ঝর্ণা এখান থেকেই নির্গত হত। গুহাটা এখনও গাঢ় সবুজ লতা-গুল্মে ভরে আছে, তবে এখন দেখতে হয়েছে কঙ্কালের খুলির অক্ষিগোলকের মত, অন্ধকার ও খালি।

'ঝর্ণা শুকিয়ে গেছে!' ফিসফিস করল নিমা, রানার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। 'বাঁধ তৈরি হবার ফলে পানির সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেছে। এ থেকেই প্রমাণ হয় টাইটার পুল থেকেই এখানে পানি আসছিল!'

'আসুন,' উত্তেজনায় নিমার একটা হাত চেপে ধরল রানা। 'এখানে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

'কোথায়?' নিমা অবাক। রানার আরও কাছে সরে এলো ও।

'কোথায় আবার, টাইটার পুলে!' ফিসফিস করল রানা। তারপর নিমাকে কাছে টানল।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে প্রথমে শক্ত কাঠ হয়ে গেল নিমা। তারপর ভয় পেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, পিছু হটল এক পা। 'না, প্লীজ!'

'কেন, নিমা?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি, আপনি চান। তাহলে আপত্তি করেন কেন?'

'চাই,' মাথা নিচু করে স্বীকার করল নিমা। 'কিন্তু...আমার সংস্কার পাঁচিল তুলে রেখেছে। আমিই আপনাকে প্ররোচিত করেছি, সেজন্যে ক্ষমা চাই, রানা। প্লীজ, আমাকে পাবার আশা আপনি ত্যাগ করুন।'

নিমার চোখে পানি দেখে হেসে উঠল রানা, নরম সুরে বলল, 'এই মেয়ে, এর মধ্যে কান্নার কি হলো? সত্যি কথা বলতে কি, আপনি ধরা না দেয়ায় আপনাকে নিয়ে আমার গর্ব হচ্ছে, তা জানেন? তবে একটা চ্যালেঞ্জও অনুভব করছি, স্বীকার না করলে মিথ্যে ভান করা হবে। ঠিক আছে, মাঝেখানের পাঁচিলটা না ভেঙে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমি। হলো?'

'ওটা বোধহয় কোনদিনই ভাঙবে না,' চোখের জল মুছে রানার দিকে মুখ তুলল নিমা। হাসছে ও। 'আপনি সত্যি খুব বিবেচক মানুষ। আপনাকে সত্যি আমার ভাল লাগে।'

এক পা পিছিয়ে গেল রানা। 'এই দেখুন, আপনার কথার আমি কোন ভুল অর্থ করছি না। কি, নিজেকে এখন নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে তো?'

এগিয়ে এসে রানার মুখে একবার হাত বুলাল নিমা। 'আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন।'

নয়

টাইটার পুলে প্রথমে নামল মাসুদ রানা। পাহাড়-প্রাচীরের মাথা থেকে নিচে নামার জন্যে এবার চওড়া কপিকল ব্যবহার করা হচ্ছে, দোলনার মত দেখতে রশির শেষ প্রান্তে কাঠের চেয়ার সহ। পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে ফুলে থাকা ঝুল-পাথরটাকে এড়াবার সময় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দুলতে শুরু করল চেয়ার, পাঁচিল আর চেয়ারের মাঝখানে আটকা পড়ল ওর ডান হাতটা। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা, হাতটা ছাড়িয়ে আনার পর দেখল একটা আঙুলের গিঁটের চামড়া উঠে গেছে, টপ টপ করে রক্ত ঝরছে ক্ষতটা থেকে। জখমটা তেমন গুরুতর নয়, মুখের ভেতর পুরে চুষে পরিষ্কার করে নিল। তারপরও অবশ্য রক্ত বেরুচ্ছে, তবে এই মুহূর্তে আর কিছু করার নেই ওর।

ঝুল-পাথরটাকে ছাড়িয়ে এসেছে কপিকল, ওর নিচে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল অতল গহ্বর, প্রায় অন্ধকার গা ছমছম করা পরিবেশ। পাথর পাঁচিলের গায়ে খোদাই করা নকশাটার ওপর চোখ আটকে গেল, খাড়া দুই সারি কুলুঙ্গির মাঝখানে। কি খুঁজতে হবে জানে বলেই এবার পঙ্গু বাজপাখিটার আউটলাইন চিনতে পারল ও। প্রায় এক মাস আগে গিরিখাদ ছেড়ে চলে যাবার পর মনে প্রায়ই একটা সংশয় জাগত যে ব্যাপারটা বোধহয় তাদের কল্পনা, পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে টাইটা নিজের কোন প্রতীক চিহ্ন খোদাই করেনি, আবার ফিরে এলে দেখতে পাবে পাঁচিলটা মসৃণ ও নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু না, ব্যাপারটা কল্পনা নয়। প্রতীক চিহ্ন একটা সত্যি

[illegible]

পায়ের নিচে গিরিখাদের তলায় তাকাল রানা, পুলের ওপর জলপ্রপাতের ধারা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। উজানে তৈরি বাঁধের ভেতর দিয়ে চোয়ানো পানি এখনও নেমে আসছে, তবে খুব বেশি নয়। ওর নিচে পুলের লেভেল নাটকীয়ভাবে কমে গেছে, পাথর পাঁচিলের গায়ে পানির ভেজা দাগ দেখে বোঝা গেল। এখন আরও পঞ্চাশ ফুট পাঁচিল পানির ওপর রয়েছে। আরও আট জোড়া কুলুঙ্গি দেখা যাচ্ছে পানির ওপর। আগে যেখানে ওগুলোর কাছে যাবার জন্যে সাঁতরাতে হয়েছে রানাকে, এখন সেখানে প্রায় কোন পানিই নেই।

তবে পুলটা পুরোপুরি পানি শূন্য হয়ে পড়েনি। মাঝখানটায় এখনও কালো পানি জমে আছে, চারপাশে সরু কার্নিস। ওই কার্নিসেই নামল রানা। বিচিত্র অভিজ্ঞতাই বলতে হবে। এখানে যখন শেষবার এসেছিল, পানির নিচের ফাটলটা ওকে টেনে নিতে চেয়েছিল ভেতরে, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে মরণপণ যুদ্ধ করতে হয়েছিল ওকে।

মুখ তুলে তাকাল রানা, গহ্বরের ওপরের স্তরে, রোদ যেখানে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। ও যেন একটা মাইনশ্যাফটের তলায় রয়েছে। তলপেটের ভেতরটা খালি খালি লাগল, সেঁতসেঁতে বাতাসে কেঁপে উঠল শরীর। কপিকলের রশিতে ঝাঁকি দিল ও, ওপর থেকে সেটা টেনে নিল ওরা। পিচ্ছিল পাথুরে কার্নিস ধরে পাহাড়-প্রাচীরের দিকে এগোল রানা, ওখানে কুলুঙ্গির সারিগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

পাঁচিলের গায়ে ফাটলটার আকৃতি এখন পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছে রানা। ওই ফাটলই ওকে নিজের শ্যাওলা ভরা গলায় টেনে নিতে চেয়েছিল। পাঁচিলের গোড়ায় পানি জমে আছে, গভীরতাও একটু বেশি, ফলে ফাটলটা প্রায় পুরোপুরি ডুবে আছে এখনও। সারফেসের ওপর দেখা যাচ্ছে শুধু নেমে আসা কুলুঙ্গি সারির নিচে খিলান আকৃতির ফাটলটার ওপরের অংশ। বাকিটা পানির নিচে।

কার্নিস ধরে পাঁচিল ঘেঁষে এগোচ্ছে রানা, ক্রমশ সরু হয়ে আসছে কার্নিস। পাঁচিলে পিঠ ঘষে এগোতে হচ্ছে ওকে, পায়ের গোড়ালি পানি ছুঁয়ে থাকছে। তারপর আর পানিতে না নেমে এগোবার উপায় থাকল না। অথচ এখানে পানির গভীরতা সম্পর্কে ওর কোন ধারণা নেই।

তবু পা শুকনো রাখার জন্যে সরু কার্নিসে উবু হয়ে বসল রানা, একটা হাত পাঁচিলে রেখে ঝুঁকল, অপর হাতটা দিয়ে ডোবা ফাটলটার নাগাল পেতে চাইছে।

গর্তটার ঠোঁট মসৃণ। কিনারাগুলো এত বেশি সরল আর ফাটলটা এত বেশি চৌকো, ধরেই নিতে হয় মানুষের তৈরি। শার্টের আস্তিন গুটাবার সময় রানা লক্ষ্য করল, ওর আহত আঙুলটা থেকে এখনও রক্ত গড়াচ্ছে। তবে গ্রাহ্য না করে হাতটা ডুবিয়ে দিল পানির তলায়। নিচের দিকটা হাতড়াচ্ছে, ফাঁকটার সিল বা গোবরাট খুঁজছে। আঙুলের ডগায় কর্কশ পলস্তারা করা একটা ব্লক ঠেকল। আরও ঝুঁকল রানা, পানির নিচে বাইসেপের অর্ধেকটা ডুবে গেল।

অকস্মাৎ জ্যান্ত একটা প্রাণী, ক্ষিপ্র ও ভারী; ঠিক ওর চোখের সামনে পানির ভেতর পাক খেলো, আঁতকে উঠে ঝট করে হাতটা পানি থেকে তুলে নিল রানা।

প্রাণীটা ওর হাতের পিছু নিয়ে সারফেস পর্যন্ত উঠে এল, ওর নগ্ন মাংসে লম্বা সূচের মত দাঁত বসাতে চেষ্টা করল। পলকের জন্যে কুৎসিত ও ভীতিকর ব্যারাকুডার মত মাথাটা দেখতে পেল ও, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল আঙুলের ক্ষত থেকে বেরুনো রক্তের গন্ধই ওটাকে আকৃষ্ট করেছে।

লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, সরু কার্নিসে টলমল করছে, অক্ষত হাতে অপর হাতের বাহু খামচে ধরেছে। প্রাণীটার শুধু সামনের একটা দাঁত স্পর্শ করেছে ওকে, অথচ তাতেই ডান হাতের উল্টোপিঠের চামড়া যেন ধারাল ক্ষুর দিয়ে চিরে দেয়া হয়েছে। ওর পায়ের সামনে পানির ওপর ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে।

চোখের পলকে কালো পানি যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল, জলজ প্রাণীর আকৃতি তীব্র উন্মাদনায় মোচড় খাওয়ায় আলোড়িত পানিতে ফেনা তৈরি হলো। পাঁচিলে পিঠ সাঁটিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে রানা। আকৃতিগুলো অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছে ও, মোচড়ানো ও আঁকাবাঁকা ফিতের মত, কোন কোনটা ওর কব্জির মত চওড়া, কালো আর চকচকে।

ঈল, বুঝতে পারল রানা। ওর জানা আছে ট্রপিক্যাল ঈল এরকম দৈত্যাকারই হয়। বদ্ধ জলে আটকা পড়েছে ওগুলো, ছোট্ট জায়গায় সংখ্যায় খুব বেশি হওয়ায় সমস্ত মাছ ইতিমধ্যে সাবাড় করে ফেলেছে, ফলে খিদের জ্বালায় এক একটা রাক্ষসে পরিণত হয়েছে। শেষবার এখানে সাঁতার কাটার সময় ওর শরীর থেকে রক্ত ঝরেনি, সেজন্যে ভাগ্যকে কৃতজ্ঞতা জানাল রানা।

গলা থেকে সুতি রুমালটা খুলে হাতের ক্ষতটা বাঁধল। পাহাড়-প্রাচীরের ফাটলটা পরীক্ষা করা সম্ভব নয়, ঈলগুলো মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে এরইমধ্যে ওগুলোয় কি ব্যবস্থা করে যায় চিন্তা করে ফেলেছে রানা।

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল পুলের পানি। চেয়ার সহ কপিকলটা নেমে আসছে আবার। 'ফাটলের ভেতর কোনও টানেল পেলেন?' চেয়ার থেকে জানতে চাইল নিমা। তারপর রানার হাতে বাঁধা রুমালটা দেখে আঁতকে উঠল। 'আরে, রক্ত কেন? কিভাবে কাটল?'

'রক্ত একটু বেশি বেরুচ্ছে, তবে ক্ষতটা গভীর নয়,' বলল রানা। 'কিভাবে হলো?' রক্তে ভেজা রুমালের একটা কোণ ছিঁড়ে পানিতে ফেলল ও। 'দেখুন।'

লম্বা আকৃতিগুলো পানিতে আলোড়ন তুলতে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল নিমা। একটা ঈল পানির ওপর মাথা তুলে শরীরের অর্ধেকটা আছড়াল সরু কার্নিসে, তারপর কয়েকটা মোচড় খেয়ে আবার অদৃশ্য হলো পানির নিচে। 'কি... কি ওগুলো?'

'বিশ্বস্ত দারোয়ান রেখে গেছে টাইটা,' বলল রানা। 'আমরা যাতে পানির নিচে ফাটলটায় ঢুকতে না পারি।'

বাঁশ দিয়ে রানা ও মারটিন যে ভারাগুলো বানিয়েছে সেগুলো ঝুলে আছে প্রায় চার হাজার বছর আগে পাথর কেটে তৈরি করা কুলুঙ্গিতে গাঁথা অবস্থায়। টাইটা প্রতিটি কাঠামো জোড়া লাগিয়েছিল সম্ভবত গাছের বাকল দিয়ে তৈরি রশি দিয়ে, তবে মারটিন ব্যবহার করেছে হেভী-গজ গ্যালভানাইজ ওয়্যার, ফলে অনেক লোকের

ভার সহ্য করার মত পোক্ত হয়েছে। বাঘ নামে শ্রমিকদের গ্রুপটা একটা চেইন তৈরি করল, সমস্ত জিনিস-পত্র আর ইকুইপমেন্ট হাতে হাতে নামতে শুরু করল এক ভারা থেকে আরেক ভারায়।

খাদের নিচে প্রথমে নামানো হলো পোর্টেবল হোন্ডা ইএমফাইভ হানড্রেড জেনারেটর। পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায় ফ্লাডলাইট সাজানো হয়েছে আগেই, কানেকশন দেয়ার পর জেনারেটর চালু করতেই উজ্জ্বল আলো বহুদূরে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ছায়াগুলোকে। ভারার ওপর থেকে শ্রমিকদের হাততালি আর হাসির আওয়াজ ভেসে এল। ফুয়েল বাঁচানোর জন্যে একটু পরই অবশ্য বন্ধ করে দেয়া হলো জেনারেটর।

জলমগ্ন ফাটলটার চারধারে গ্যাবিয়ন অর্থাৎ তারের জালে আটকানো বোল্ডার ফেলা হলো, এরপর বালতি করে শুরু হবে পানি সেচা। তার আগে সবাইকে ভারার ওপর আশ্রয় নিতে বলল রানা, পুলের কিনারায় একা থেকে গেল ও, সঙ্গে ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড ভরা একটা ব্যাগ। গ্রেনেডগুলো গেরিলা লীডার অ্যালান শাফির কাছ থেকে দান হিসেবে পেয়েছে ও।

পিন খোলার সাত সেকেন্ড পর বিস্ফোরিত হলো ওগুলো, পুলের মাঝখানে একের পর এক অনেকগুলো ছুঁড়ে দিল রানা। একটা করে ছোড়ে, কার্নিস ধরে যতটা সম্ভব দূরে সরে আসে, কানে হাত। শেষ গ্রেনেডটা বিস্ফোরিত হবার পর পুলের কিনারায় ফিরে এসে রানা দেখল অসংখ্য ঈল মারা গেছে, তবে আহত হয়ে মোচড় খাচ্ছে তারচেয়েও বেশি, বিস্ফোরণের ধাক্কায় পুলের পানি থেকে ডাঙায় উঠে এসেছে। ভারা থেকে নেমে এসে শ্রমিকরা মরা ও আধমরা ঈলগুলো তুলে যত্ন করে সাজিয়ে রাখছে দেখে রানা একজন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা এগুলো খান?'

পেটে হাত বুলিয়ে সন্ন্যাসী একগাল হাসলেন, 'ভারি স্বাদ!'

একটা বাঁশ দিয়ে পুলের গভীরতা মাপল রানা, প্রায় সাত ফুট। গ্যাবিয়ন ফেলে পুলটাকে অর্ধচন্দ্র আকৃতিতে ঘিরে ফেলা হয়েছে, বালতি দিয়ে বাঘেরা পানি সেচতে শুরু করল। পানির লেভেল নিচে নামছে, সেই সঙ্গে পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ার ফাটলটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে।

একটু পরই বোঝা গেল ফাটলটা প্রায় চৌকোই, তিন মিটারের মত চওড়া, দু'মিটারের মত উঁচু। পাশ আর ছাদ পানির তোড়ে ক্ষয়ে গেছে, তবে পানির লেভেল আরও নিচে নামতে সুগঠিত পাথুরে ব্লক-এর অবশিষ্ট দেখতে পেল ওরা, ওগুলো সম্ভবত ফাটলটা বন্ধ করে রেখেছিল। চার প্রস্থ ব্লক এখনও অক্ষত রয়েছে, প্রাচীন রাজমিস্ত্রী ফাটলটার গোড়ায় যেখানে বসিয়েছিল; বাকিগুলো কয়েক হাজার বছরের বন্যায় ভেঙে গেছে, ঢুকে পড়েছে পিছনের টানেলে। ফলে আংশিক বন্ধ হয়ে আছে টানেলটা।

পুলে নামল রানা। পানি এখনও হাঁটু সমান। ফাটলটার সামনে হেঁটে এসে খালি হাতে পাথুরে আবর্জনা সরাচ্ছে। নিমাও ধৈর্য ধরতে পারল না, পুলে নেমে রানার পাশে চলে এল। 'টানেল বলেই তো মনে হচ্ছে!' উত্তেজনায় ফিসফিস করল ও। 'নাকি শ্যাফট? কিন্তু বাধাটা কেন? টাইটার ইচ্ছাকৃত নয় তো?'

'বলা কঠিন। নদীর মূল স্রোত থেকে প্রচুর আবর্জনা ঢুকেছে ভেতরে।' খানিকটা হতাশ দেখাল রানাকে। 'আর্কিওলজির নিয়ম ধরে পথটা পরিষ্কার করতে হলে কয়েক হপ্তা লেগে যাবে। ও-সব এখানে আমাদের পোষাবে না। আলো আর লোকবল যখন আছে, রাতদিন হাত লাগিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে হবে কাজটা।'

'ওঁরা ডানডেরা নদীতে বাঁধ দিয়েছেন,' হেস ডুগার্ডকে বললেন কারিফ ফারুকী। 'মাসুদ রানার ক্যাম্পে আমাদের স্পাই আছে, সেই রিপোর্ট পাঠিয়েছে। খাদের ভেতর তিনশো লোককে কাজে লাগিয়েছেন তিনি, ইকুইপমেন্ট আর সাপ্লাইয়ের পরিমাণও বিপুল। এমন কি একটা ট্র্যাক্টরও নিয়ে গেছেন।'

ভুরু কুঁচকে জ্যাক রাফেলের দিকে তাকালেন হেস ডুগার্ড, রাফেল মাথা ঝাঁকাল। গম্ভীর দেখাল জার্মান বিলিওনিয়ারকে। জরুরী স্যাটেলাইট মেসেজ পেয়ে আদ্দিস আবাবায় চলে আসেন তিনি, ওখান থেকে জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টারে চড়ে পৌঁছেছেন অ্যাবে গিরিখাদের ওপর প্রক্সি বেস ক্যাম্পে, এসকার্পমেন্টের চূড়ায়।

ডানডেরা নদীকে বাঁধ দিয়ে বাঁধা চাট্টিখানি কথা নয়, জানেন তিনি। অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আবিষ্কার না করলে এত বড় একটা কাজে হাত দেবে না তাঁর প্রতিপক্ষ মাসুদ রানা, এ-ও তাঁর কাছে পরিষ্কার। ঠিক কোথায় বাঁধটা দেয়া হয়েছে দেখতে চাইলেন তিনি। স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফের ওপর একটা ক্রশ চিহ্ন আঁকল রাফেল। তাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেন বাঁধ দিল ওরা? কারণটা ব্যাখ্যা করো, রাফেল।'

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে অনুমান পাল্টা অনুমান করার পর সবাই একমত হলো, পানির নিচে কিছু একটার নাগাল পেতে চেয়েছে রানা। তারপর প্রশ্ন উঠল, ড্যাম সাইটের নিচে কি আছে? রাফেল জানাল, বাঁধটার ঠিক নিচে নদী ঢুকে পড়েছে সরু ও গভীর একটা নালার ভেতর। নালাটা আট মাইল লম্বা, শেষ মাথার ওপরে রয়েছে মঠটা। ওই নালার ওপর দিয়ে হেলিকপ্টার নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব, তবু কয়েকবার গেছে রাফেল। একবার তারা রানা আর ওঁর বান্ধবীকে নালার ওপর উঁচু জমিনে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখেছে। কি করছিল ওরা? না, কিছু করছিল না, নালার ওপর পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় বসে ছিল শুধু। হেলিকপ্টারটা ওরা দেখতে পায়? হ্যাঁ, অবশ্যই, দেখতে পেয়ে রানা হাতও নাড়ে। হেস ডুগার্ড বললেন, 'তোমাদের আওয়াজ পেয়ে বসে পড়েছিল ওরা, তার আগে নিশ্চয়ই ওখানে কিছু করছিল।' তারপর সিদ্ধান্তে আসলেন, 'রানা বিশ্বাস করে ড্যামের নিচে খাদের ভেতর সমাধিটা আছে।' রাফেলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্পাই লোকটা কখন আর কিভাবে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে?'

রাফেল ব্যাখ্যা করল। এসকার্পমেন্টের কয়েকটা গ্রাম থেকে কিছু কিছু সাপ্লাই গ্রহণ করছে রানা, খচ্চরের পিঠে মাল-পত্র চাপিয়ে ওদের ক্যাম্পে আসা-যাওয়া করছে কয়েকজন মহিলা। স্পাই লোকটা ওই মহিলাদের হাতে রিপোর্ট পাঠায়।

'পরশুর মধ্যে রিপোর্ট করো আমাকে, বাঁধের নিচে কি করছে রানা,' নির্দেশ দিলেন হেস ডুগার্ড। কনফারেন্স টেবিলের উল্টোদিকে বসা কর্নেল জুলিয়াস ঘুমার

দিকে তাকালেন। 'এলাকায় কতজন লোককে আপনি ডিউটিতে রাখছেন?'

'তিনটে পুরো কোম্পানী, সব মিলিয়ে তিনশো'র বেশি লোক,' জবাব দিলেন কর্নেল ঘুমা। 'সবাই অভিজ্ঞ যোদ্ধা।'

'কোথায় তারা? ম্যাপে আমাকে দেখান।'

তাঁর পাশে চলে এলেন কর্নেল। 'একটা কোম্পানী এখানে। দ্বিতীয়টা ডেবরা মারিয়াম গ্রামে। তৃতীয়টা এসকার্পমেন্টের নিচে, রানার ক্যাম্পে হামলা চালাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে।'

'আমার ধারণা হামলাটা এখুনি চালানো দরকার,' কারিফ ফারুকী বললেন। 'শত্রুকে সময় দিতে নেই।'

'চুপ করুন!' ধমক দিলেন হেস ডুগার্ড। 'আমি আপনার মতামত চেয়েছি?' ম্যাপটা কিছুক্ষণ দেখার পর কর্নেলকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'গেরিলা কমান্ডারের সঙ্গে কতজন রয়েছে, জানেন? কি যেন নাম তার, রানাকে সাহায্য করছে?'

'অ্যালান শাফি। একশোরও কম, সম্ভবত পঞ্চাশজন, বাঁধ আর ক্যাম্প পাহারা দিচ্ছে।'

দু'আঙুলের মাঝখানে ধরে কানের লতি মোচড়াচ্ছেন হেস ডুগার্ড। গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁর ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি ফুটল। 'দ্বিতীয়বার যে পথে ইথিওপিয়ায় ঢুকেছে রানা, বেরিয়েও যাবে সেইপথে, গেরিলা কমান্ডারের সাহায্য নিয়ে,' বললেন তিনি। 'ঢোকার সময় বৈধ পথ ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না, বেরিয়ে যাবার সময় আরও সম্ভব হবে না। কাজেই আমি চাই ওই পথে ডেবরা মারিয়াম কোম্পানীটাকে মোতায়েন করুন আপনি, কর্নেল ঘুমা। নদীটার দুই দিকেই পাহারায় থাকুক তারা, মঠের নিচে। রানা যেন উদ্ধার করা ট্রেজার নিয়ে সুদান সীমান্তে পৌঁছুতে না পারে।'

'ইয়েস, গুড আইডিয়া!' কর্নেলকে উল্লসিত দেখাল।

'আপনার বাকি লোককে এসকার্পমেন্টের নিচে জড়ো করুন। গেরিলাদের চোখে ধরা পড়া চলবে না, তবে বাঁধ দখল করার জন্যে তৈরি হয়ে থাকতে হবে। আমি নির্দেশ দিলেই যাতে হামলা শুরু করতে পারে।'

'হামলাটা কখন শুরু করব আমরা?'

'রানার ওপর কড়া নজর রাখা হবে,' বললেন হেস ডুগার্ড। 'আর্টিফ্যাক্ট সরাতে শুরু করলে আমরা জানতে পারব। অনেকগুলোই এত বড় হবে যে লুকানো সম্ভব নয়। তখনই হামলা করব আমরা। ওরা চুরি করছে, আমরা ওদের ওপর বাটপারি করব।'

টানেলের মুখ পরিষ্কারের কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে। শিফটিং পদ্ধতিতে কাজ চলছে, নতুন শিফট শুরু হবার আগে মারটিনের স্টীল টেপ নিয়ে টানেলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে রানা। শেষবার মাপার পর বলল, 'একশো বিশ ফুট পরিষ্কার করা হয়েছে। শাবাশ, বাঘের বাচ্চা,' টোরা নাবুকে বলল ও। টোরা নাবু স্বেচ্ছাসেবী সন্ন্যাসীদের ফোরম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

টানেলের মেঝে এখনও তির্যক একটা পথ ধরে নিচের দিকে ঢালু হয়ে

আছে। ফ্লাডলাইটের আলোয় টানেলের প্রবেশ মুখটা এখন পরিষ্কারই চৌকো দেখাচ্ছে। টানেলটা যে একজন এঞ্জিনিয়ারের নকশা ধরে তৈরি করা হয়েছে, এখন আর তাতে কোন সন্দেহ নেই। পায়ের কাছে পানি-কাদায় পড়ে থাকা একটা জিনিস দেখতে পেয়ে ঝুঁকল রানা, দু'আঙুলে ধরে ফ্লাডলাইটের আলোয় পরীক্ষা করল।

টানেল থেকে বেরিয়ে এল রানা হাসতে হাসতে। পুলটাকে ঘিরে থাকা নিচু পাঁচিলের ওপর বসে রয়েছে নিমা, জিনিসটা ওকে দেখাল। ছোঁ দিয়ে রানার হাত থেকে নিয়ে নিল নিমা, চিৎকার করে উঠল, 'ওহ্, সুইট মেরি! রানা, এ আপনি কোথায় পেলেন?'

'কাদায় পড়েছিল,' বলল রানা। 'চার হাজার বছর ধরে। জিনিসটা কি চিনতে পারছেন? মদের পাত্র ছিল এক কালে, তারই ভাঙা একটা টুকরো। সম্ভবত টাইটার কোন শ্রমিকের হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায়।'

মৃৎপাত্রের টুকরোটা হাত দিয়ে ঘষে চুমো খেলো নিমা। 'আমরা যে ঠিক পথ ধরে এগোচ্ছি, এটা তার আরেকটা প্রমাণ।'

পরবর্তী শিফটের কাজ দু'ঘণ্টা চলার পরই শেষ বাধাটা অপসারিত হলো, হৈ-চৈ শুনে টানেলের ভেতরে ঢুকে রানা দেখল বড় একটা বোল্ডার এক পাশে সরিয়ে আনার পর সামনে একটা ফাঁক তৈরি হয়েছে। পাঁচিলের এই জানালার ভেতর টর্চের আলো ফেলল ও। খালি ও কালো শূন্যতা ছাড়া আর কিছু দেখার নেই। পিছিয়ে এসে টোরা নাবুর পিঠ চাপড়ে দিল ও। 'প্রত্যেকের জন্যে এক ডলার করে বোনাস। তবে কাজ চালিয়ে যাও, সমস্ত আবর্জনা সরিয়ে ফেলতে হবে।' আবর্জনা সরাতে আরও দু'শিফট লাগল। ফাঁকটা বড় হবার পর দেখা গেল সামনে একটা গুহা রয়েছে।

গুহা মানে বিরাট একটা গর্ত। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দশ ফুট নিচে পানি দেখা যাচ্ছে, চারপাশে গোলাকার ও খাড়া পাঁচিল। টর্চের আলোয় দেখা গেল ছাদে কয়েকটা ফাটল তৈরি হয়েছে, সম্ভবত কোন এক কালে পাথর ধসে পড়েছিল। গুহা বা গর্তের ওপারে কালো ছায়া ছাড়া কিছুই দেখা যায় না, দূরত্ব হবে একশো ফুট বা আর কিছু বেশি।

পানিতে না নেমে এই বাধা পেরুনো সম্ভব নয়। ত্রিশ ফুট লম্বা একটা বাঁশ এনে গভীরতা মাপার চেষ্টা করা হলো, কিন্তু থই পাওয়া গেল না। 'এর মানে?' রানাকে জিজ্ঞেস করল নিমা, বিহ্বল দেখাচ্ছে ওকে।

'আমার ধারণা, এটা একটা ন্যাচারাল ফল্ট,' বলল রানা। 'পানিকে পথ দেখিয়ে পাহাড়ের অপরদিকে নিয়ে গেছে, সারফেসে আবার বেরিয়েছে সেই প্রজাপতি ফোয়ারায়। নদী আসলে নিজেই নিজের পথ খুঁড়ে নিয়েছে।'

'পানি তাহলে জমে আছে কেন?'

'শ্যাফটে একটা ইউ বেন্ড থাকায়, সম্ভবত,' বলে নিচের পানিতে টর্চের আলো ফেলল রানা। আলোয় আকৃষ্ট হয়ে সারফেসের দিকে উঠে এল একটা ঈল, দেখে আঁতকে উঠল নিমা।

গুহাটার ওপারে আরেক বার টর্চের আলো ফেলল রানা। গর্তটা যদি পাথর

ধসে তৈরি হয়ে থাকে, টাইটার টানেল তাহলে তো গুহার ওপারেও থাকার কথা। আছেও, যদিও ওর চোখে নয়, ধরা পড়ল নিমার চোখে। 'ওটা কি, চৌকো ফাঁকটা?'

মুচকি হেসে রানা বলল, 'ওটাই আমি খুঁজছিলাম। এই টানেলেরই অংশ ওটা।'

'আমরা ওপারে যাব কিভাবে?' নিমা উদ্বিগ্ন।

'আশপাশে প্রচুর বেওব্যাব গাছ আছে, ওগুলোর শুকনো কাঠ খুব হালকা,' বলল রানা। 'ভাসমান একটা ব্রিজ বানাতে কতক্ষণই বা লাগবে।'

বেওব্যাব গাছের কাণ্ড পাশাপাশি পানিতে ফেলে তার দিয়ে বাঁধা হয়েছে, ভাসমান সেতু পেরিয়ে সিঙ্ক-হোল-এর ওপারে প্রথমে পৌঁছাল রানা, তারপর ওর পিছু নিয়ে নিমা। টানেলের দ্বিতীয় অংশের মুখে দাঁড়াল দু'জন, ভেতরে টর্চের আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে দুই অংশের পার্থক্যটা ধরা পড়ল চোখে। মূল স্রোতটা নিশ্চয়ই সিঙ্ক-হোল দিয়ে বেরিয়ে যেত। টানেলের দ্বিতীয় অংশের মাপ প্রথমটার মতই–তিন মিটার চওড়া, দুই মিটার উঁচু। তবে চৌকো আকৃতি আরও বেশি স্পষ্ট। পাঁচিল আর ছাদ কর্কশ হলেও, এগুলোকে আকৃতি দেয়ার জন্যে যে টুলস ব্যবহার করা হয়েছে তার চিহ্ন পরিষ্কার চোখে পড়ল। পায়ের নিচে টানেলের মেঝে চ্যাপ্টা পাথর ফেলে তৈরি করা হয়েছে, পলেস্তারার কাজ এখনও সবটুকু ক্ষয়ে যায়নি। টানেলের পুরোটা দৈর্ঘ্য জলমগ্ন ছিল, পানি সরে যাবার পরও পিচ্ছিল হয়ে আছে শ্যাওলায়। ভেতরের বাতাসে পচা একটা গন্ধ ভেসে আছে। মারটিন তার টেনে নিয়ে এসে আলো জ্বালার ব্যবস্থা করল। ওরা দেখল, দ্বিতীয় অংশের শ্যাফট ক্রমশ ওপর দিয়ে উঠে গেছে।

'টাইটা প্রথমে টানেলটাকে নিচে নামিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছিল, পরে আবার ওপরে তুলেছে,' মন্তব্য করল নিমা, হাসছে। রানার পাশে রয়েছে ও, দু'জনেই শ্যাফট ধরে সাবধানে এগোচ্ছে। প্রতিটি পদক্ষেপ গুনছে রানা।

একশো দশ কদম হাঁটার পর দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। সামনের টানেল ভিজে নয়, মেঝে ও পাঁচিল শুকনো খটখটে। আরও পঞ্চাশ পা এগোল ওরা, পাঁচিলের দাগ দেখে বোঝা গেল বন্যার সময়ও এই লেভেলে পানি উঠত না। এদিকের মেঝে ও পাঁচিল চার হাজার বছর আগে মিশরীয় ক্রীতদাসরা যেভাবে তৈরি করে রেখে গেছে এখনও ঠিক তেমনি আছে। ব্রোঞ্জের তৈরি বাটালির দাগগুলো এত তাজা, মনে হচ্ছে মাত্র ক'দিন আগে কাজ শেষ করে ফিরে গেছে তারা। আরও দশ গজ এগোবার পর একটা পাথুরে ল্যান্ডিঙে পৌঁছুল ওরা। মেঝে এখানে সমতল। টানেল এখানে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে, একশো আশি ডিগ্রী কোণ ঘুরে।

'পানির লেভেল এখান পর্যন্ত কোনদিনই উঠবে না, এ-কথা টাইটা জানল কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তখনকার দিনে নিখুঁত মাপজোকের জন্যে কোন যন্ত্রপাতি ছিল না, অথচ হিসেবে তার এতটুকু ভুল হয়নি।'

'কেন, স্ক্রোলে তো সে বারবার বলেছে, আমি একটা জিনিয়াস। তার দাবি স্বীকার করে নিতে হয়,' বলল নিমা।

পাশাপাশি একশো আশি ডিগ্রী বাঁকটা ঘুরল ওরা। হাতের ইলেকট্রিক ল্যাম্পটা উঁচু করে ধরে আছে রানা, পিছনে কেবল ঝুলছে। সামনের দিকটা আলোকিত হয়ে উঠতে বিস্ময়সূচক একটা আওয়াজ করল নিমা, রানার খালি হাতটা খামচে ধরল। দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জনেই, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।

টানেলের নিচের যে অংশটা ওরা পেরিয়ে এসেছে সেটা তৈরি করার সময় তেমন একটা যত্ন নেয়া হয়নি, দেয়াল আর মেঝে এবড়োখেবড়ো ছিল, ছাদে ছিল ফাটল। তারমানে টাইটা জানত নিচের লেভেলটা পানিতে ডুবে থাকবে, তাই সৌন্দর্য বাড়ানোর কোন চেষ্টা করেনি।

এখন ওদের সামনে থেকে ওপরে উঠে গেছে একটা চওড়া সিঁড়ি। একটু তির্যক ভঙ্গিতে উঠেছে, ফলে সিঁড়ির মাথাটা দেখা যাচ্ছে না। প্রতিটি ধাপ টানেলের পুরো প্রস্থের সমান লম্বা, পুরো এক হাত চওড়া। চকচকে, মসৃণ পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ধাপগুলো, এত নিখুঁত কাজ যে জয়েন্টগুলো চোখে পড়ে না। নিচের অংশের টানেলের চেয়ে এদিকের টানেলের ছাদ তিনগুণ বেশি উঁচু, সারি সারি গম্বুজের মত দেখতে, প্রতিটি গম্বুজের মাপ সমান। দেয়াল আর ছাদের গম্বুজে আবরণ হিসেবে বসানো হয়েছে নীল গ্র্যানিট ব্লক। তবে কোথাও কোন অলংকরণ চোখে পড়ল না।

রানার হাতে মৃদু চাপ দিল নিমা। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। ধাপগুলো মিহি ধুলোয় ঢাকা, নরম আর ট্যালকম পাউডারের মত সাদা। কিছু দূর ওঠার পর সিঁড়ির মাথাটা দৃষ্টিপথে চলে এল। রানার হাতের তালুতে নখ ঢুকিয়ে দিল নিমা। সিঁড়িটা শেষ হয়েছে আরেকটা ল্যান্ডিঙে, ল্যান্ডিঙের ওপারে চারকোনা একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। ল্যান্ডিঙ পেরিয়ে দরজাটার সামনে দাঁড়াল ওরা। বিরল এক শুভ মুহূর্ত উপস্থিত, ওরা যেন নিঃশব্দে অনন্তকাল ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল, পরস্পরের হাত শক্ত করে ধরে আছে।

নদীর সাদা মাটি দিয়ে প্লাস্টার করা দরজা, দেখে মনে হলো আইভরি দিয়ে মোড়া। কোথাও কোন দাগ নেই, যেন ত্রুটি হীন কোন কুমারীর ত্বক। সাদা প্লাস্টারের মাঝখানে এমবস করা একজোড়া সীল রয়েছে। ওপরের সীলটার আকৃতি চৌকো একটা গিট, মুড়ে রেখেছে শিং-ওয়ালা গুবরে পোকা। বৃত্তাকার শিং অনন্তকাল বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। এটা রাজকীয় একটা প্রতীক চিহ্ন। লেখাগুলো, হায়ারোগ্লিফিকস, পড়ল নিমা, তবে নিঃশব্দে।

'সর্বশক্তিমান। ঐশ্বরিক ও স্বর্গীয়। মিশরীয় নিম্ন ও উচ্চ রাজ্যসমূহের শাসক। গড হোরাস-এর ঘনিষ্ঠ। অসিরিসি আর আইসিসি-এর প্রিয়পাত্র; মামোস, তিনি যেন চিরজীবী হন।'

রাজকীয় সীলের নিচে ছোট আরেকটা ডিজাইন রয়েছে, বাজপাখির আকৃতি, ভাঙা ডানা সেঁটে আছে বুকে, আর লেখাগুলো–'আমি, ক্রীতদাস টাইটা, আপনার নির্দেশ পালন করেছি, স্বর্গীয় ফারাও।' পঙ্গু বাজপাখির নিচে আর মাত্র একটা লাইন দেখা গেল, তার অর্থ করলে দাঁড়ায়–'আগন্তুক! দেবতারা দেখছেন! রাজার চিরকালীন বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালে চড়া মাশুল দিতে হবে।'

***